Entertaining Lessons

IN

SCIENCE AND LITERATURE

PART III.

Thirtyfirst Edition.

চারুপাঠ।
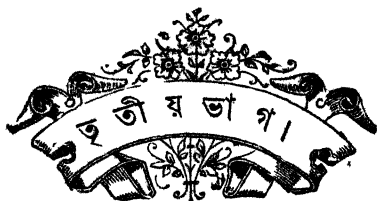
অক্ষয়কুমার দত্ত-প্রণীত।

একত্রিংশবার মুদ্রিত।

Calcutta:

PRINTER—JOGESH CHANDRA AUDHIKARY,

METCALFE PRESS.

76. *Balaram Dey Street,*

PUBLISHED BY JOGENDRANATH MUKHERJI

AT THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY

CORNWALLIS STREET.

1912.

বিজ্ঞাপন।

নূতন গ্রন্থ রচনা করা দূরে থাকুক, আমার পূর্ব্ব-লিখিত প্রস্তাব সমুদয় সংশোধন করিয়া মুদ্রিত করিবারও সামর্থ্য নাই। কোন কোন পরমাত্মীয় ভদ্র ব্যক্তি অনুগ্রহপূর্ব্বক চারুপাঠের তৃতীয় ভাগ খানি মুদ্রিত করিয়া তুলিলেন, তাহাতেই ইহা মুদ্রিত হইয়া উঠিল। এদেশীয় বিদ্যালয় সমুদায়ের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা যেমন কৃপা করিয়া চারুপাঠের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ স্ব স্ব বিদ্যালয়ে ব্যবহার করিলেন, তৃতীয় ভাগ খানিও সেইরূপ করিলে কৃতার্থ হইব।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।

২২ আষাঢ়। ১৭১৮ শক।

ত্রিংশবারের বিজ্ঞাপন।

শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীদিগের সুবিধার জন্য, বর্ত্তমান সংস্করণে গ্রন্থকারের জীবনী এবং গ্রন্থোক্ত যাবতীয় স্থানের বিবরণ ও পাত্রের পরিচয় সংযোজিত হইল। দুরূহ শব্দের অর্থ এবং অপেক্ষাকৃত দুরূহ অংশগুলির সরল অথচ সঙ্ক্ষিপ্ত তাৎপর্য্যও দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ভূমিকা।

'চারুপাঠ।'

চারুপাঠ অপরিণত মানব-মনের এবং তরুণ মস্তিষ্কের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টির অদ্বিতীয় সহায়। আমোদের সঙ্গে শিক্ষার যে নুতন রীতি সম্প্রতি এদেশের বিদ্যালয়-সমূহে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, চারুপাঠের দূরদর্শী গ্রন্থকার বর্ত্তমান আন্দোলনের বহু বৎসর পূর্ব্বে, সেই রীতির অনুসরণেই এই চারুপাঠ রচনা করেন। চারুপাঠ or Entertaining Lessons নামই এ কথা প্রতিপন্ন করিতেছে। বাহ্য জগতের সঙ্গে মানব-মনের পরিচয়-সাধন, বিজ্ঞান-বিষয়ে কৌতূহলোদ্দীপন এবং হৃদয় ও মনের সদ্‌বৃত্তি-সমূহের সম্যক্ উদ্‌বোধন এই গ্রন্থত্রয়ের উদ্দেশ্য। চারুপাঠের অনুকরণে এ পর্য্যন্ত অনেক পুস্তক রচিত হইয়াছে; কিন্তু কোনটীই এরূপ সমাদর লাভ করে নাই। ইহার কারণ কি ?

গ্রন্থকার।

গ্রন্থকারের বিশেষত্বই ইহার প্রধান কারণ। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের মত জ্ঞান-তৃষ্ণা এ দেশে অতি অল্প লোকেরই দেখা

যায়। তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল "শিখিব ও শিখাইব।" যিনি জীবনে বাস্তবিক জ্ঞানের পিপাসা অনুভব করিয়া জ্ঞানান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি যেমন সুন্দররূপে এবং সহজে অন্যের জ্ঞান-তৃষ্ণা মিটাইতে পারিবেন, আর কেহ তাহা পারিবে না। এক দিকে তাঁহার রচনার সঙ্গে তাঁহার বিজ্ঞান-নিষ্ঠ জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল; অন্য দিকে তিনি একজন ক্ষমতাশালী লেখক,—ভাষার অন্তর্গূঢ় শক্তি তাঁহার করায়ত্ত। সুতরাং অক্ষয়কুমারের রচিত চারুপাঠকে স্কুল-বহি বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিলে চলিবে না।

বঙ্গ-সাহিত্যে 'চারুপাঠ'।

স্থায়ী সাহিত্যে চারুপাঠের স্থান আছে কি না, এই বিষয় লইয়া, কেহ কেহ তর্ক তুলিয়াছেন; এরূপ তর্ক উঠিবার বিশেষ কোনো ভিত্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না। নানারূপ অলীক ধারণা ও ভ্রান্ত সংস্কারকে প্রশ্রয় দেওয়া সত্ত্বেও পুরাতন পঞ্চতন্ত্র যদি সংস্কৃত সাহিত্যে বহু যুগ ব্যাপিয়া স্থান পাইয়া থাকে, তবে আদর্শের উচ্চতা, ভাষার স্নিগ্ধ-গম্ভীর মনোহারিতা, বিষয়-বৈচিত্র্য এবং চিত্ত-বিকাশের পক্ষে বিশেষ উপযোগিতার জন্য চারুপাঠও যুগযুগান্ত ধরিয়া বঙ্গের স্থায়ী সাহিত্যে মর্য্যাদার সহিত স্থান পাইবে। বিজ্ঞান ও নীতির শুষ্ক-কঙ্কাল বিজ্ঞান-প্রেমিকের অনুরাগ-মন্ত্রে সঞ্জীবিত হইলে, কতদূর যে মনোরম হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত, বঙ্গভাষায়—একমাত্র চারুপাঠ।

গ্রন্থকারের জীবন-কথা।

বংশ-পরিচয়।

বঙ্গীয় গদ্যের গৌরবস্থল স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের পূর্ব্ব-পুরুষেরা টাকীর নিকট গন্ধর্ব্বপুর গ্রামে বাস করিতেন। ইঁহারা বঙ্গজ কায়স্থ। অক্ষয়কুমারের প্রপিতামহ রাজবল্লভ বর্দ্ধমান রাজসরকারে কর্ম্ম করিতেন। তিনিই প্রথম গন্ধর্ব্বপুরের বাস উঠাইয়া, নবদ্বীপের সমীপবর্ত্তী চুপী গ্রামে বসতি করেন।

রাজবল্লভের যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রামশরণ নিতান্ত শিশু। জননীর অনুগত রামশরণ শৈশবকাল হইতে বিধবা জননীর সঙ্গে একত্র নিরামিষ ভোজনে এমনি অভ্যস্ত হইয়া যান যে, তিনি চেষ্টা করিয়াও জীবনে কখনো মৎস্য মাংস স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন না। রামশরণের চতুর্থ পুত্র পীতাম্বর। পীতাম্বরের শেষ সন্তান অক্ষয়কুমার। পিতামহ রামশরণের আমিষ-বিতৃষ্ণা পৌত্র অক্ষয়কুমারে বর্ত্তিয়াছিল; "আমিষ অবিধি" বলিয়া আন্দোলন করিবার অন্তর্গূঢ় কারণ অক্ষয়কুমারের অস্থিমজ্জার মধ্যেই নিহিত ছিল।

পীতাম্বর দত্ত মহাশয় খিদিরপুর কুতঘাটের কেসিয়ার ছিলেন। বেতন অল্প, কিন্তু, উহারই মধ্যে, নিজের ব্যয় সাধ্যমত সংক্ষেপ করিয়া, কর্ম্মস্থল হইতে বাড়ী ফিরিবার সময়ে, প্রতিবাসী ও গ্রামবাসীদের জন্য, দুষ্প্রাপ্য ঔষধ ও পথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইতেন। শোনা যায়, গ্রামে ফিরিয়া পীতাম্বর বয়োবৃদ্ধ মাত্রকেই শ্রদ্ধার সহিত প্রণাম করিতেন। নিষ্ঠাবান্ হিন্দু হইলেও, এ বিষয়ে তিনি জাতি পাঁতি মানিয়া চলিতেন না।

পীতাম্বরের পত্নীর নাম দয়াময়ী। কৃষ্ণনগরের নিকট ইট্‌লে গ্রামে দয়াময়ীর পিত্রালয়। পিতার নাম রামদুলাল গুহ। সৌজন্যে, দয়ায়, বিচক্ষণ বিবেচনায় এবং সহজ বুদ্ধির প্রাচুর্য্যে দয়াময়ী পীতাম্বরের প্রকৃত সহধর্ম্মিণী ছিলেন।

জন্ম।

১২২৭ সালের ১লা শ্রাবণ তারিখে, হোরা পঞ্চমীর দিনে চুপীর বাড়ীতে অক্ষয়কুমারের জন্ম হয়। ঐ বৎসরে আর একজন প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। উভয়ের জন্ম-বৎসরে যেমন এক, কর্ম্মক্ষেত্রেও তেমনি নানা সূত্রে বহুবার দুইজনকে একত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

অক্ষয়কুমারের জন্মের পূর্ব্বে, দয়াময়ীর আরও তিন চারিটি সন্তান হয়, তাহারা সকলেই অল্প বয়সে বিনষ্ট হইয়া যায়।

বাল্য-জীবন।

মৃত-বৎসা জননীর আদরের সন্তান অক্ষয়কুমার মাতৃ-হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ একাকী ভোগ করিতে পাইয়াছিলেন। বোধ হয়, এইজন্য তাঁহার মধ্যে দ্বন্দ্বের ভাব তেমন করিয়া কখনও মাথা তুলিতে পারে নাই। তাঁহার বৈষয়িক চিঠিপত্র হইতে জানা যায়, পাওনা-গণ্ডা বুঝিয়া লইতে, অক্ষয়কুমারের তেমন আগ্রহ ছিল না; অপর পক্ষ সন্তুষ্টচিত্তে ধর্ম্ম ভাবিয়া, যতটুকু দিতে স্বীকৃত হন, তাহাই তিনি যথেষ্ট মনে করেন, মোটের উপর বিরোধ মিটিলেই তিনি বাঁচিয়া যান। বাল্যকাল হইতেই তিনি অত্যন্ত নিরীহ ও নির্ব্বিরোধ ছিলেন। এই শান্তগম্ভীর বালকটির কৌতূহলের কিন্তু অন্ত ছিল না। কাঠাকালি কষিতে কষিতে পৃথিবী কয় কাঠা, জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল জন্মিয়াছিল।

এইরূপে কয়েক বৎসর পল্লী-পাঠশালায় কাটাইয়া দশ বৎসর বয়সে অক্ষয়কুমার খিদিরপুরের বাসায় আসিলেন। এই সময়ে পিয়ার্সন্ সাহেবের প্রাকৃতিক ভূগোলের বঙ্গানুবাদ তাঁহার হাতে পড়ে। জিজ্ঞাসু শিশুর হৃদয়ে এতদিন আত্মীয় স্বজন ও গুরুমহাশয়ের নিকট বৃষ্টি, বিদ্যুৎ প্রভৃতি বিশ্ব-ব্যাপার সম্বন্ধে যেটুকু অভিজ্ঞতা সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা যে একেবারেই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না। পূর্ব্বেই চাণক্য-শ্লোক পড়িবার সময়, সর্ব্বত্র-পূজ্য বিদ্বান্ হইবার জন্য তাঁহার মন লালায়িত হইয়াছিল ; এইবার দশ বৎসর বয়সের অক্ষয়কুমার, জ্ঞানের আকর ইংরাজী ভাষা শিখিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

কিছুদিন তিনি এক মাষ্টারের কাছে পড়িলেন। কিন্তু সেই মাষ্টার ভাল ইংরাজী জানিতেন না। অক্ষয়কুমার অল্প দিনেই সে কথা বুঝিতে পারিলেন এবং পিতৃব্যপুত্র হরমোহন দত্তের কাছে অনুযোগ করিলেন। অভিভাবকেরা তাঁহাব শিক্ষা-বিষয়ে তেমন মনোযোগ করিতেছেন না দেখিয়া, তিনি এক মিশনরি স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। তখনকার নিষ্ঠাবান্ হিন্দুরা খ্রীষ্টান্ স্কুলে ছেলে পাঠানো ভাল বিবেচনা করিতেন না। অভিভাবকেরা ভয় করিলেন, ছেলে খৃষ্টান্ হইবে। এইবার অক্ষয়-কুমারকে ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনারিতে ভর্ত্তি করা হইল। খিদিরপুর হইতে প্রত্যহ পদব্রজে যাওয়া আসায় যথেষ্ট সময় নষ্ট হইতেছে দেখিয়া, অক্ষয়কুমার নিজ পিস্তুতো ভাই রামধন বসু মহাশয়ের কলিকাতার বাড়ীতে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স প্রায় ষোল বৎসর ; ইহার পূর্ব্বেই, তের বৎসর বয়সে, আগড়পাড়ার রামমোহন ঘোষের কন্যা শ্যামাসুন্দরীর সহিত অক্ষয়কুমারের বিবাহ হয়।

ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনারিতে অক্ষয়কুমার একেবারে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। রীতিমত ইংরাজী শিক্ষার এই আরম্ভ। পর বৎসর

পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হওয়ায়, স্কুলের অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহাকে পঞ্চম শ্রেণী হইতে একেবারে তৃতীয় শ্রেণীতে উঠাইয়া দেন। ইহার কিছুদিন পরেই পীতাম্বর দত্ত মহাশয়ের কাশীধামে মৃত্যু হয়। সে সময়ে অক্ষয়কুমার তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। পিতৃবিয়োগে অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজন ঘটিল এবং বিদ্যালয়ও ছাড়িতে হইল।

কর্ম্মজীবন।

প্রভাকর-সম্পাদক, কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকরের জন্য সুপ্রীম কোর্টের বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিতে, হরমোহন দত্তের নিকট প্রায়ই যাইতেন। হরমোহন দত্ত মহাশয় সুপ্রীম কোর্টে কর্ম্ম করিতেন। এই সূত্রে অক্ষয়কুমারের সহিত গুপ্ত-কবির পরিচয় ঘটে। এক দিন ঈশ্বরচন্দ্রের সহকারী অনুপস্থিত ছিলেন। ঘটনাক্রমে সেদিন অক্ষয়কুমার "প্রভাকর"-কার্য্যালয়ে বেড়াইতে যান। গুপ্ত-কবি অক্ষয়কুমারকে প্রভাকরের জন্য ইংরাজী খবরের কাগজ হইতে কিছু অনুবাদ করিয়া দিতে বলেন; তাহাতে অক্ষয়কুমার বলেন, "আমার দ্বারা উহা সম্ভব নয়, আমি কখনও গদ্য লিখি নাই।" শেষে গুপ্ত-কবি পুনর্ব্বার অনুরোধ করায় অক্ষয়কুমার অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। লেখা দেখিয়া, ঈশ্বরচন্দ্র বলিলেন, "যিনি বহুদিন অবধি এই কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন, তিনিও এমন সুন্দর লিখিতে পারেন না।" এই অক্ষয়কুমারের গদ্য-রচনার সূত্রপাত। ইহার পূর্ব্বে তিনি কেবল "অনঙ্গ-মোহন" নামে একখানি পদ্য-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

বিদ্যালয় ছাড়িয়াও অক্ষয়কুমার বিদ্যাচর্চ্চা ছাড়েন নাই। এই সময়েই তিনি নিজের চেষ্টায় উচ্চাঙ্গের গণিত, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান এবং জর্ম্মন্ প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করেন। এ সময়ে রাজা রাধাকান্তদেবের

দৌহিত্র, হিন্দু কলেজের ছাত্র, স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয় ইঁহার সহায় ছিলেন। বিদ্যাসাগর ইংরাজী সাহিত্যে চর্চ্চা করিবার জন্য প্রায়ই আনন্দমোহনের নিকট যাইতেন। এই সময়েই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের আলাপ হয়।

১২৪৬ সালে স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি সভা স্থাপন করেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই সভার সভ্য ছিলেন। তাঁহার কথায় অক্ষয়কুমারও ঐ সভার সভ্য হন। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপের এই সূত্রপাত। পরবৎসর এই সভার যত্নে "তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা" স্থাপিত হয়। অক্ষয়কুমার মাসিক আট টাকা বেতনে ঐ পাঠশালায় পদার্থবিদ্যা ও ভূগোলের শিক্ষক হইলেন।

১২৪৮ সালে তত্ত্ববোধিনী সভার অর্থে ইঁহার রচিত "ভূগোল" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকাগারে একখানি মাত্র আছে। ১২৪৯ সালে, অক্ষয়কুমার টাকীর ৺প্রসন্নকুমার ঘোষের সহযোগিতায়, বিদ্যাদর্শন নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। বিদ্যাদর্শন মোটে ছয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়া যায়।

১২৫০ সালে তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্যোগে তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা প্রথম প্রচারিত হয় এবং অক্ষয়কুমার উহার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। প্রবন্ধ-গৌরবে এবং বিষয়-বৈচিত্র্যে তত্ত্ববোধিনী অল্পদিনের মধ্যেই দেশ-বিখ্যাত হইয়া উঠিল। তখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায় বঙ্গভাষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। তথাপি গ্রাহক-সংখ্যা সাতশত দাঁড়াইল। বন্ধু-বৎসল বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমারকে মাসিক দেড়শত টাকা বেতনে শিক্ষা-বিভাগের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টরের কর্ম্ম করিয়া দিবার জন্য সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্ করিলেন, কিন্তু অক্ষয়কুমার সে কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন না। তত্ত্ববোধিনীর

সংস্রবে থাকিলে স্বদেশে সুশিক্ষা-বিস্তারের সহায়তা করিতে পারিবেন,—শুধু এই আনন্দে তিনি ষাট টাকার চাকরীতেই সন্তুষ্ট রহিলেন।

লিখিতে আরম্ভ করিলে, অক্ষয়কুমারের সংজ্ঞা থাকিত না। লিখিতে লিখিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইত, চাকরেরা বাতি জ্বালিয়া খাবার রাখিয়া, দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া, প্রস্থান করিত। হুঁস্ নাই। প্রভাতে পত্রিকা-সম্পর্কীয় কর্ম্মচারীরা নিয়মিত সময়ে কার্য্যালয়ে আসিয়া দেখিত, খাবার পড়িয়া আছে, অক্ষয়কুমার বঙ্গভাষার জন্য "অক্ষয় যশের মালা" রচনা করিতে ব্যস্ত। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কাল এইরূপ কঠোর পরিশ্রম করিয়া, শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। অর্শ ও উদরাময় পূর্ব্বেই দেখা দিয়াছিল। তাহার উপর ১২৬২ সালের আষাঢ় মাসে মূর্চ্ছার সঙ্গে দুশ্চিকিৎস্য শিরোরোগ আসিয়া জুটিল। তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদকতা ছাড়িতে হইল। অতঃপর তিনি কিছু দিন নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কর্ম্ম করিয়াছিলেন। কিন্তু পীড়া-বৃদ্ধি হওয়ায়, তাহাও ছাড়িতে হইল। এই সময়ে বিদ্যাসাগরের যত্নে ও প্রস্তাবে তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে তাঁহার মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা হইল। ইহাতে তিনি সাংসারিক দুশ্চিন্তা হইতে কিয়ৎপরিমাণে অব্যাহতি পাইলেন।

তত্ত্ববোধিনী সভার এই বিশেষ বৃত্তি অক্ষয়কুমার অধিক দিন গ্রহণ করেন নাই। পুস্তকের আয়ে যেমন গ্রাসাচ্ছাদনের অসুবিধা দূর হইল, অমনি বিনয়ের সহিত লিখিয়া পাঠাইলেন,—"আমি আর তত্ত্ববোধিনী সভাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিব না।"

সাহিত্য-জীবন।

অক্ষয়কুমারের প্রথম রচনা 'অনঙ্গমোহন' এখন পাওয়া যায় না। ১২৪৮ সালে তাঁহার ভূগোল প্রকাশিত হয়। তখন তাঁহার বয়স প্রায়

একুশ বৎসর। আমরা সেই ভূগোলের ভূমিকা হইতে অক্ষয়কুমারের প্রথম বয়সের গদ্য-রচনার কিছু নমুনা দিতেছি,—"ইদানীং দেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী মহাশয়দিগের দৃঢ় উদ্‌যোগে স্থানে স্থানে যে প্রকার প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে বঙ্গভাষার অনুশীলন হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে এ দেশীয় ব্যক্তিগণের বিদ্যাবুদ্ধির উন্নতি হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এ ভাষায় এ প্রকার প্রচুর গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না যে, তদ্দ্বারা বালক-দিগকে সুচারুরূপে শিক্ষা প্রদান করা যায়। এই সুযোগযুক্ত সময়ে যদি এ অকিঞ্চন হইতে কিঞ্চিৎ দেশের উপকার সম্ভবে, এই মানস করিয়া চন্দ্র-সুধা-লোভী উদ্‌বাহু বামনের ন্যায় দীর্ঘ আশায় আসক্ত হইয়া, বহু ক্লেশে বহু ইংরাজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বালকদিগের বোধগম্য অথচ সুশিক্ষাযোগ্য এই ভূগোল পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছি। * * * এই পুস্তক প্রস্তুত হইয়া উপায়াভাবে কিয়ৎকাল অপ্রকটিত ছিল। পরে তত্ত্ববোধিনী সভা বিশেষরূপে সুপ্রসন্না হইয়া স্বীয় বিত্তব্যয় দ্বারা ইহাকে প্রকাশিত করত যে প্রকার কৃপা বিতরণ করিলেন, তাহাতে সাহসপূর্ব্বক কহিতে পারি, উক্ত সভার এরূপ অনুগ্রহ না হইলে এই পুস্তক সাধারণ সমীপে কদাচ এরূপে উদিত হইতে পারিত না, অতএব চিত্তমধ্যে এই অতুল উপকারকে যাবজ্জীবন জাগরূক রাখিয়া, তাহার কৃপামূল্যে বিক্রীত থাকিলাম।"

বর্ত্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনার সঙ্গে এই রচনার যতখানি প্রভেদ, তদপেক্ষা এই ভূগোলের অনতিপূর্ব্বে প্রকাশিত যে কোনো গদ্য গ্রন্থের ভাষাগত প্রভেদ অনেক বেশী। ভাষা দিব্য অনায়াস-গতি লাভ করি-য়াছে. জড়তা একেবারে নাই বলিলেও চলে. অথচ এ সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোনো গ্রন্থই রচিত বা প্রচারিত হয় নাই। কবিশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভাষায় বলিতে গেলে,

অক্ষয়কুমারের এই বাল্যরচনা, বিদ্যাসাগরেরও পূর্ব্বে, "গ্রাম্য-পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য-বর্ব্বরতার" হস্ত হইতে আপনাকে নির্ম্মুক্ত করিয়াছিল।

ছন্দ যে কেবল পদ্যের সামগ্রী নহে, সে কথাটা অনেক সময়ে অনেক লেখকের ধারণায় আসে না। মানুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যেও ছন্দ আছে, চলিবার সময়ে পা ফেলিতে হয় তালে তালে; অথচ গদ্য রচনায় ছন্দ যতি বা তাল না মানিলেও চলিবে, ইহা একেবারেই ভুল। যাঁহারা যথার্থ ভাষা-শিল্পী, তাঁহারা, অলঙ্কার-শাস্ত্রে বিশেষ উল্লেখ না থাকিলেও, গদ্যের এই দুর্নিরীক্ষ্য ছন্দের নিয়ম আপনা হইতেই ধরিতে পারেন। অক্ষয়কুমারও যে তাহা পারিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার এই বাল্য-রচনার ক্ষুদ্র নমুনাটিও পরিব্যক্ত করিতেছে।

এই স্বভাবসিদ্ধ রচনা-নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়াই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদন-ভার প্রদান করেন। সে কথা তিনি আত্মজীবনীতে স্পষ্টই লিখিয়াছেন।

ভূগোল প্রকাশের পূর্ব্ব হইতে অক্ষয়কুমার নীতি-তরঙ্গিণী সভায় যে সমস্ত বক্তৃতা করেন এবং প্রভাকরে যে সমস্ত প্রবন্ধ লেখেন, তৎসমূহের সমসাময়িক উচ্ছ্বসিত প্রশংসার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি এখনো শোনা যায়। দুঃখের বিষয়, সে সমস্ত রচনা রক্ষিত হয় নাই।

ভূগোলের পর ১৭৭৩ শকে বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারের প্রথম ভাগ এবং ৭৪ শকে ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। দুই ভাগই জর্জ্জ কুম্ব্ প্রণীত Constitution of man নামক গ্রন্থের মূলতত্ত্বের ভিত্তির উপরে রচিত। মৌলিক গবেষণাও উহাতে যথেষ্ট আছে। যুরোপীয় এবং ভারতীয় জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহের নিয়মগুলিকে নিরপেক্ষভাবে তুলনায় সমালোচনা করিয়া, প্রকৃত পন্থা-নির্দ্দেশের অকৃত্রিম চেষ্টাও উহাতে পরিলক্ষিত হয়। প্রথম ভাগ আমিষ ভোজনের বিরুদ্ধে

এবং দ্বিতীয় ভাগ সুরাপান নিবারণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয়। এই গ্রন্থে যে দুইটি আন্দোলনের সূত্রপাত্র হয়, তাহার ফলে অনেকেই—বর্দ্ধমানের মহারাজ পর্য্যন্ত—মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করেন, এবং ভদ্রসমাজে মদ্যের প্রভাব অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়।

১৭৭৪ শকে চারুপাঠের প্রথম ভাগ, ৭৬ শকে দ্বিতীয় ভাগ এবং ৮১ শকে তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। ধর্ম্মনীতি ও পদার্থবিদ্যা যথাক্রমে ৭৭ ও ৭৮ শকে প্রকাশিত হইয়াছিল।

অনেকের ধারণা এগুলি ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ। এ বিষয়ে স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "যাঁহারা এইরূপ নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা বোধ হয়, ইংরাজী গ্রন্থের সহিত অক্ষয়কুমারের গ্রন্থ মিলাইয়া দেখেন নাই। মীর্জ্জার স্বপ্নদর্শনের আদর্শে চারুপাঠের স্বপ্নদর্শন লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু, মীর্জ্জার স্বপ্নদর্শনে যাহা নাই, চারুপাঠের স্বপ্নদর্শনে তাহা আছে। আডিসনের কল্পনা অপেক্ষা অক্ষয়কুমারের কল্পনার অধিকতর বিকাশ হইয়াছে। অধ্যাপক উইলসনের 'হিন্দুধর্ম্ম-সম্প্রদায়' ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের আদর্শ হইলেও, শেষোক্ত গ্রন্থে অনেক নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।" ১৭৯২ শকে এই উপাসক সম্প্রদায়ের প্রথম ভাগ এবং ১৮০৪ শকে দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। এই বৃহদায়তন গ্রন্থ পুরাতত্ত্বের নানা জটিল তথ্যের মীমাংসায় এবং কূট তর্কের আলোচনায় পরিপূর্ণ, অথচ যখন উহা রচিত হয়, তখন অক্ষয়কুমার অর্শে, উদরাময়ে এবং মস্তিষ্কের পীড়ায় অস্থির। কাহারো সঙ্গে জোরে কথা কহিলে যন্ত্রণা-বৃদ্ধি হয়; দুই চারি পঙ্ক্তির অধিক একসঙ্গে রচনা করিতে পারেন না এবং যতটুকু রচনা করেন, সেটুকুও নিজে লিখিতে গেলে মাথা ঘুরিয়া যায়। ঔষধ মকরধ্বজ চতুর্ম্মুখ প্রভৃতির শিশি কৌটায় ঘর বোঝাই।

পথ্য পল্‌তার ঝোল, মাংসের ক্বাথ, বেলের মোরব্বা। কিন্তু "ঈপ্সিতার্থ-স্থির-নিশ্চয় মন" অপটু শরীর ও পীড়িত মস্তিষ্কের উপর জয়ী হইল। দুশ্চর তপস্যা নিষ্ফল হইবার নয়। বিশেষজ্ঞ ম্যাক্‌স্‌মূলার লিখিলেন—"আপনার মূল্যবান্ মৌলিক গবেষণা-সংবলিত উপাসক-সম্প্রদায় পড়িয়া প্রীতিলাভ করিলাম।"

অক্ষয়কুমারের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় রজনীনাথ দত্ত মহাশয়ের সম্পাদকতায় অক্ষয়কুমারের আর একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানির নাম "প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্র-যাত্রা ও বাণিজ্য-বিস্তার।"

অক্ষয়কুমারের প্রবর্ত্তিত রচনা-প্রণালী বহুদিন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে আদর্শ-রচনা-প্রণালী-রূপে প্রচলিত ছিল। তাঁহার প্রণালীর অনুসরণে যাঁহারা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্য স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় অন্যতম। রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের গ্রন্থাবলীতেও অক্ষয়কুমারের প্রভাব অল্পবিস্তর অনুভূত হয়।

বঙ্গভাষার ব্যাকরণকে কোন কোন বিষয়ে সংস্কৃত-নিরপেক্ষ করিবার চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন। সম্বোধন পদে 'মুনে!' 'দেবি!' প্রভৃতির পরিবর্ত্তে 'মুনি!' 'দেবী!' লিখিবার রীতি তিনিই প্রবর্ত্তন করেন।

ভূগোল, প্রাকৃতিক ভূগোল, ভূতত্ত্ব, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ্-বিদ্যা, প্রাণি-বিদ্যা, নীতি-বিদ্যা, শারীর-বিধান, তাড়িত-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের অন্তর্গত নানা বিষয়ের প্রবন্ধ রচনার সময়ে সুতীক্ষ্ণ মনীষাসম্পন্ন অক্ষয়কুমার বৈজ্ঞানিক পরিভাষাকেও অনেক পরিমাণে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গভাষা এজন্যও যে তাঁহার নিকট প্রভূত-পরিমাণে ঋণী, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শেষ-জীবন।

বালিগ্রামে 'শোভনোদ্যান' নামক নিজ উদ্যান-বাটিকায় অক্ষয়কুমারের শেষ জীবন অতিবাহিত হয়। শোভনোদ্যান ক্ষুদ্র হইলেও, সেকালে "কনিষ্ঠ বোটানিক্ গার্ডেন" নামে পরিচিত ছিল। নানাদেশ হইতে আনীত এত বিচিত্র তরুলতার সংগ্রহ, তখন এদেশের আর কোন উদ্যানেই ছিল না।

শারীরিক অসুস্থতার জন্য এই সময়ে অক্ষয়কুমার বিষয়-কর্ম্ম কিছুই দেখিতে পারিতেন না। কর্ম্মচারীরা যাহা খুসী তাহাই করিত। ইহাদের মধ্যে একজন কয়েক সহস্র টাকা আত্মসাৎ করিয়া পলাইয়া যায়; শেষে রাজদণ্ডের ভয় দেখাইয়া পত্র লিখিলে, ঐ ব্যক্তি উত্তরে লেখে,—"আমি বিধবা-বিবাহ করিলে আপনি আমাকে পুরস্কৃত করিবেন বলিয়াছিলেন, আমি বিধবা-বিবাহ করিয়াছি, জানিবেন।" অক্ষয়কুমার অনুসন্ধানে জানিলেন, লোকটা বিধবা-বিবাহ করিয়াছে বটে; জানিয়াই চিঠি লিখিলেন,—"সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিলাম।" এরূপ ঘটনা অনেকবার ঘটিয়াছে। তিনি নিজে তালি দেওয়া জুতা জামা এবং তালি দেওয়া তৈজস ব্যবহার করিতেন, অথচ দুঃস্থের দুঃখ দূর করিতে এবং সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠানের জন্য প্রার্থীর প্রার্থনার অতিরিক্ত চাঁদা দিতে অক্ষয়কুমার মুক্ত-হস্ত ছিলেন।

ইঁহার গৃহসজ্জা ছিল—প্রস্তরীভূত জীবজন্তু, শঙ্খ-শম্বুক; যত্নের সামগ্রী ছিল—আশ্রম-তরুগুলি; এবং চিত্ত-বিনোদনের উপায় ছিল—রাসায়নিক ও আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা। প্রত্যহ প্রভাতে বেড়াইবার জন্য একখানি গাড়ী রাখিয়াছিলেন। গাড়ীখানি ছিল—বিষম ভারী, ঘোড়াটি ছিল—মন্থর-গতি; তাহার উপর গাড়ী হাঁকানো হইত—অতি ধীরে। জোরে হাঁকাইলেই

মাথা ঘুরিয়া উঠিত। শুনিতে পাই, সেকালে বালিগ্রামের অল্পবয়স্ক বালকেরা, সহপাঠীদের মধ্যে যাহারা জড়-ভাবাপন্ন, তাহাদিগকে "অক্ষয় দত্তের ঘোড়া" বলিয়া পরিহাস করিত।

শিরঃপীড়ার প্রকোপে ক্রমে অক্ষয়কুমারের একটি চক্ষু ছোট হইয়া গেল, অনবরত কবিরাজী তৈল মালিস করায়, সম্মুখের কেশগুলি খাটো হইয়া পড়িল, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মলিন হইল এবং দেহ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িল। এ অবস্থায় বেশী লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎও করিতে পারিতেন না, অথচ হৃদয় একেবারে নীরস হইয়া যায় নাই। বাল্যের অভ্যাস-মত বৃদ্ধ বয়সেও প্রত্যহ কতকগুলি কাককে নিজ খাদ্যের অংশ দিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। প্রত্যহ বেড়াইতে যাইবার সময়, দানে এবং কুশল-প্রশ্নে, পথের অন্ধ, অনাথ সকলকেই "তুষিয়া" যাইতেন। কিছুদিন পূর্ব্বে স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পুত্র স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বসু "প্রবাসী"তে পিতৃবন্ধু অক্ষয়কুমারের যে পত্রগুলি প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহাতেও এই সরসতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

অক্ষয়কুমার পাঠ্যাবস্থায় মহাকবি হোমার বিরচিত ইলিয়াড্ কাব্যের পোপ-কৃত ইংরাজী অনুবাদ পড়িয়া জানিতে পারেন যে, প্রাচীন গ্রীস্‌ও আমাদের ভারতবর্ষের মত বহু দেবতার আরাধনা করিত। শিক্ষকের কাছে প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, গ্রীস্ এখন একেশ্বরবাদী এবং সমস্ত গ্রীস্ জাতি পূর্ব্বে যে সব দেবতাদের ভয়ে কম্পমান ছিল, সেই সব দেবতারা এখন কৌতুকাগারে কৌতুকের সামগ্রী হইয়া আছেন। অক্ষয়কুমারের মনের মধ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইল; তিনি প্রতিমা-পূজার বিরোধী হইলেন। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে, তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্পর্শে আসিয়া তিনি ব্রাহ্মমত অবলম্বন করেন। ইহার পরে, বিজ্ঞান-সম্মত পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ব পাঠে, মানুষের জ্ঞান যে ইন্দ্রিয়-বোধের দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং ইন্দ্রিয়-

বোধেরই সমষ্টি মাত্র, এইরূপ তাঁহার ধারণা জন্মে। তত্ত্বান্বেষী অক্ষয়কুমার সুতরাং কতকটা অজ্ঞেয়বাদী হইয়া পড়িলেন। শেষ বয়সে, বোধ হয়, বহু আলোচনা ও বহু দর্শনের ফলে, জগতের আদিকারণ বিশ্ববীজের প্রতি জ্ঞানযোগী অক্ষয়কুমার পুনর্ব্বার আস্থাবান্ হইয়াছিলেন। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদর্শনে অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; ঐ প্রবন্ধ পাঠে জানা যায় যে, চিঠি-পত্রের শিরোদেশে লোকে যেমন 'শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়,' 'শ্রীহরি শরণ,' 'ওঁ' প্রভৃতি লেখে, অক্ষয়কুমার শেষবয়সে তেমনি 'বিশ্ববীজ' লিখিতেন।

১২৯৩ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ (২৭ এ মে ১৮৮৬) তারিখে অক্ষয়কুমারের মৃত্যু হয়। পত্নী-বিয়োগ পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল। পুত্র-শোকও পাইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে একজন মাত্র জীবিত ছিলেন।

মহামনা, মনস্বী অক্ষয়কুমারের অন্তঃকরণের মহত্ত্ব তাঁহার মৃত্যুতেও অমর হইয়া আছে। সামান্য অবস্থার গৃহস্থ হইয়াও তিনি স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির প্রায় এক-চতুর্থাংশ দরিদ্র-সেবায় ও সাধারণ-হিতে নিয়োজিত করিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতা
১লা মাঘ, ১৩১৬

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সূচীপত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

৺অক্ষয়কুমার দত্ত

চারুপাঠ।

তৃতীয় ভাগ।

—:*:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

স্বপ্নদর্শন,—বিদ্যাবিষয়ক।

পরমেশ্বরের বিচিত্র রচনা দর্শনার্থে পরম কৌতূহলী হইয়া, আমি কিয়ৎকালাবধি দেশ-ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং নানা স্থান পর্য্যটন-পূর্ব্বক এখন মথুরা-সন্নিধানে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছি। এখানে এক দিবস দুঃসহ গ্রীষ্মাতিশয়-প্রযুক্ত অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া, সায়ংকালে যমুনাতীরে উপবেশন-পূর্ব্বক সুললিত লহরী-লীলা অবলোকন করিতেছিলাম। তথাকার সুস্নিগ্ধ মারুত-হিল্লোলে শরীর শীতল হইতেছিল। কত শত দীপ্যমান হীরক-খণ্ড গগন-মণ্ডলে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং তন্মধ্যে দিব্য-লাবণ্য-পরিশোভিত পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান হইয়া,

কখনও আপনার পরম রমণীয় অনির্ব্বচনীয় সুধাময় কিরণ বিকিরণ পূর্ব্বক জগৎ সুধাপূর্ণ করিতেছিলেন, কখনও বা অল্প অল্প মেঘাবৃত হইয়া, স্বকীয় মন্দীভূত কিরণ-বিস্তার দ্বারা পৌর্ণমাসী রজনীকে উষানুরূপ ম্লান করিতেছিলেন। কখনও তাঁহার সুপ্রকাশিত রশ্মিজাল সলিল-তরঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া, কম্পমান হইতেছিল; কখনও গগনালম্বিত মেঘবিম্ব দ্বারা যমুনার নির্ম্মল জল ঘনতর শ্যামবর্ণ হইয়া, অন্তঃকরণ হরণ করিতেছিল। পূর্ব্বে দূর হইতে লোকালয়ের কলরব শ্রুত হইতেছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া, স্ব স্ব স্থানে নিলীন হইল, এবং সর্ব্বসন্তাপ-নাশিনী নিদ্রা জীবগণের নেত্রোপরি আবির্ভূত হইয়া, সকল ক্লেশ শান্তি করিতে লাগিল।

এইরূপ সুস্নিগ্ধ সময়ে আমি তথায় এক পাষাণখণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া, আকাশ-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে, জগতের আদি অন্ত,কার্য্য কারণ, সুখ দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম সমুদায় মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে জল-কল্লোলের কলকল-ধ্বনি বৃক্ষ-পত্রের শরশর-শব্দ ও সুশীতল সমীরণের সুন্দর হিল্লোলদ্বারা আমার পরম সুখানুভব হইয়া মনোবৃত্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিল এবং এই অবসরে নিদ্রা আমার অজ্ঞাতসারে নয়ন-দ্বয় নিমীলিত করিয়া, আমাকে অভিভূত করিল। আমার বোধ হইল, যেন এক বিস্তীর্ণ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি। তন্মধ্যে কোন স্থানে কেবল নবীন-দূর্ব্বাদল-পরিপূর্ণ শ্যামবর্ণ ক্ষেত্র, কুত্রাপি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুরাতন বৃক্ষ-সমূহ, কোথাও নদী বা নির্ঝর-তীরস্থ মনোহর কুসুমোদ্যান দর্শন করিয়া অপর্য্যাপ্ত আনন্দ লাভ করিলাম। কৌতূহল-রূপ দীপ্ত হুতাশন ক্রমশঃ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল; এবং তদনুসারে দিগ্‌বিদিক্ বিবেচনা না করিয়া, যতদূর দৃষ্ট হইল, তত দূরই মহোৎসাহে ও পরমসুখে পর্য্যটন* করিতে লাগিলাম।

অবশেষে এক সরোবর-তীরস্থ অতি নিবিড় নির্জ্জন নিস্তব্ধ বন-খণ্ডে, এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম। তাঁহার অত্যুজ্জ্বল প্রসন্ন বদন ও অলৌকিক শান্ত স্বভাব অবলোকনে, তাঁহাকে বন-দেবতা জ্ঞান করিয়া, বিহিত-বিধানে নমস্কার করিলাম ও তাঁহার পুনঃ পুনঃ দর্শন-লাভদ্বারা নয়ন-যুগল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত কৃতাঞ্জলি-পুটে দণ্ডায়মান থাকিলাম। দেখিলাম, তিনি আপনার কপোল-প্রদেশে হস্তার্পণ করিয়া, গগন-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন। আমি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসার মানস করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার বাক্য-স্ফুরণ না হইতেই, তিনি গাত্রোত্থান করিয়া, সাতিশয় আগ্রহ-প্রকাশ-পূর্ব্বক কহিলেন,—"আমি তোমার মানস জানিয়াছি; আমার নাম বিদ্যা; তুমি যে স্থানে যাইবার প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহার এই পথই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। যাঁহারা এই রম্য কানন ভ্রমণকরিতে আইসেন, আমিই তাঁহাদিগকে পথ প্রদর্শন করি; চল, তোমাকেও সঙ্গে লইয়া যাই।"

আমি তাঁহার এই আশ্বাস-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, হৃষ্টমনে তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম। উভয়-পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্যদেশ দিয়া কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে, অরণ্যের শৈত্য, শোভা ও পবিত্রতা প্রত্যক্ষ করিয়া, অতুলানন্দ প্রাপ্ত হইলাম, এবং অত্যন্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া,তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"দেবি! এস্থানের নাম কি এবং এখানে কি কি অপূর্ব্ব ব্যাপারই বা সম্পন্ন হইয়া থাকে?" তাহাতে তিনি সত্বর হইয়া উত্তর করিলেন,—"এ বিদ্যারণ্য, এ অরণ্যে সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ আছে, অতি ভাগ্যবান্ ব্যক্তিরাই এখানে আগমন করেন; কিন্তু ইহার ফলভোগ করা অতিশয় আয়াস-সাধ্য, সকলের ভাগ্যে ঘটে না। কেহ কেহ দূর হইতে কোন বৃক্ষের উচ্চতা দর্শনমাত্রে পরাঙ্মুখ হইয়া প্রতিগমন করেন, কেহ কেহ বা ফল আহরণের প্রত্যাশায় কতক দূর

বৃক্ষারূঢ় হইয়াও পুনর্ব্বার অধঃপতিত হন। কিন্তু যে ব্যক্তি একবার এই রমণীয় কাননের ফলভোগ করিয়াছেন, তিনি আর কদাপি তাহার আস্বাদন বিস্মৃত হইতে পারেন না। আমি তোমাকে ক্রমে ক্রমে সমুদায় দর্শাইতেছি, চল। ঐ যে সুদৃশ্য মনোহর বৃক্ষ সম্মুখে দৃষ্টি করিতেছ, যাহার সতেজ শাখা-সমুদায় সুমধুর-রসস্ফীত-ফল-ভরে অবনত হইয়াছে, যাহার স্কন্ধ হইতে সুধাময় মধু-ধারা সকল অনবরতই ক্ষরিতেছে ও সুকুমার-মতি তরুণ যুবকেরা যাহাতে সুখে আরোহণ করিতেছে, উহার নাম কাব্য-তরু। দেখিয়াছ, অলঙ্কৃতি-রূপা কি অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য রমণীয়-লতা তাহাকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে। ঐ বৃক্ষ হইতে কিছু দূরে, যে প্রকাণ্ড তেজস্বী বৃক্ষ দেখিতেছ, সুধীর প্রবীণ ব্যক্তিরা যাহার সেবা করিতেছেন, তাহার নাম জ্যোতিষ।” ইহা কহিয়া বিদ্যাদেবী ঐ বৃক্ষের অশেষ গুণ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার বাক্যাবসান হইলে, আমি জ্যোতিষ-তরুর নিকট-বর্ত্তী হইয়া দেখিলাম, পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত-সমুদায় এক এক বার প্রগাঢ়রূপ মনোনিবেশ-পূর্ব্বক ধ্যান-পরায়ণ হইতেছেন, আর বার প্রসন্ন-বদনে হাস্য করিয়া, অতুল আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। পরন্তু আর এক অসাধারণ ব্যাপার দেখিয়া, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম। ঐ বৃক্ষের মূল মৃত্তিকা-সংযুক্ত নহে; আর এক প্রকাণ্ড প্রাচীন বৃক্ষের স্কন্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমি এই শেষোক্ত তরুর ন্যায় সারবান্ বৃক্ষ আর একটিও দৃষ্টি করি নাই। তাহার কোন স্থানের কণামাত্রও ক্ষয় নাই ও কুত্রাপি একটিমাত্র ছিদ্র কিংবা চিহ্ন নাই। আমি এই অদ্ভুত তরুর বিষয় সবিশেষ জানিবার জন্য পরম কৌতূহলী হইয়া, বিদ্যাদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন,—“এই সারবান্ অক্ষয় বৃক্ষের নাম গণিত। তুমি কেবল সম্মুখবর্ত্তী জ্যোতিষ-তরুর

মূল ইহাতে সম্বদ্ধ দেখিতেছ, প্রদক্ষিণ করিয়া দেখ, অন্যান্য কত আশ্চর্য্য বৃক্ষ ও লতা ইহার স্কন্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়া, তদুপরি প্রতিষ্ঠিত আছে।" বস্তুতঃ আমি বেষ্টন করিয়া দেখিলাম, তাঁহার কথা প্রামাণিক বটে; শাখা প্রশাখা ও বৃক্ষ-রুহ-সংবলিত এক গণিত-বৃক্ষ অর্দ্ধ কানন ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

তথা হইতে প্রস্থানানন্তর আমার সমভিব্যাহারিণী পথ-প্রদর্শিকা বনদেবী সানুগ্রহ-বচনে বলিলেন,—"সর্ব্বদেশীয় বৃক্ষ-লতাদি আনয়ন করিয়া এ কাননে রোপণ করা গিয়াছে। জ্যোতিষ ও গণিতের কয়েকটা কলম তোমাদিগের দেশ হইতেও আহরণ করা গিয়াছে। দেখ, ভিন্ন-জাতীয় লোকে এই কাননে অবস্থিতি করিয়া, উৎসাহ ও যত্ন-সহকারে তাহার কেমন পারিপাট্য ও উন্নতি সাধন করিয়াছে! আর তোমার স্বদেশীয় লোকদিগকে ধিক্কার করিতে হয়; কারণ, যতগুলি বৃক্ষ রক্ষণাবেক্ষণের ভার কেবল তাঁহাদিগের উপর সমর্পিত আছে, প্রায় তাহার সমুদায়ই ভগ্ন ও শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। দক্ষিণ দিকে যত বৃক্ষ দেখিতেছ, সমস্তই এক-জাতীয়; তাহার নাম স্মৃতি; আর বাম দিকে যত দৃষ্ট হইতেছে, তাহার নাম দর্শন।" আমি ঐ উভয়জাতীয় বৃক্ষ অবলোকন করিয়া, যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইলাম। ঐ সমস্ত সহজেই অসার, রন্ধ্র-পরিপূর্ণ, কোনটা বা নিতান্ত শূন্য-গর্ভ, তাহাতে আবার সমুচিত যত্ন-সহকারে পরিপালিত না হওয়াতে, অতিশয় দুরবস্থ হইয়া রহিয়াছে। দেখিলাম, দক্ষিণদিকে সমুদায় বৃক্ষ যদিও সম্যক্‌রূপে নষ্ট হয় নাই, কতকগুলি শুষ্ক ও ভগ্ন-শাখ হইয়াছে, কিন্তু পারিপাট্য নাই; বোধ হইল, যেন প্রবল ঝঞ্ঝাবাত দ্বারা সমুদায় বিপ্লুত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। বামদিকের কোন বৃক্ষের কেবল স্কন্ধমাত্র আছে, কোনটির বা সমুদায় গিয়া এক দিকের একমাত্র শাখা আছে,

তদ্ভিন্ন কোন কোন বৃক্ষের স্কন্ধমাত্র দৃষ্টিগোচর হইল না। এই দুঃসহ দুঃখের সময়ে এক পরমকৌতুক দেখিলাম, কতকগুলি অভিমানী মনুষ্য উভয়পার্শ্বস্থ বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া, অত্যন্ত দম্ভ ও ব্যাপকতা-সহকারে মহাকোলাহল ও বিষম কলহ আরম্ভ করিয়াছে।

এইরূপ শারীরস্থান, রসায়ন, চিকিৎসা প্রভৃতি অনির্ব্বচনীয় পরম রমণীয় তরু-সমূহ দর্শন করিয়া, সাতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইলাম এবং অতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া পথিমধ্যে পরমারাধ্যা বিদ্যাদেবীকে কহিলাম,—"দেবি! আমি তোমার প্রসাদে অদ্য অনুপম সুখলাভ করিলাম। ভূ-মণ্ডলে এত নির্ম্মল সুখ-ধাম আর কোথাও নাই। আমার বোধ হয়, এ স্থানে বিশুদ্ধ-চিত্ত সচ্চরিত্র ব্যক্তিরাই আগমন করেন, অপর লোকের এখানে আসিবার অধিকার নাই।" এই কথা শ্রবণমাত্র তিনি বিষণ্ণ-বদনে কহিলেন,—"তুমি যথার্থ বিবেচনা করিয়াছ, এ স্থান ধর্ম্ম-শীল সাধু ব্যক্তিদিগেরই যোগ্য বটে এবং পূর্ব্বে ইহা তাদৃশই ছিল। তখন কেবল পরোপকারী, তত্ত্ব-পরায়ণ, পুণ্যাত্মা আচার্য্য সকলেই এই পরম পবিত্র কাননে উপবেশন করিয়া, অতুল আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু এক্ষণে এ বনে নানা বিভীষিকা উপস্থিত হইয়াছে; পাপ-রূপ পিশাচের উপদ্রবে ইহা অতি সঙ্কট-স্থান হইয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখ, বিজাতীয় বেশধারী অভিমান স্বমস্তক উন্নত ও গ্রীবা দেশ বক্র করিয়া, অত্যন্ত উগ্রভাবে সকলের উপর খরতর দৃষ্টিপাত করিতেছে ও স্বকীয় পুত্র দম্ভকে সমভিব্যাহারে লইয়া, মহাশ্লাঘা-প্রকাশ-পূর্ব্বক সগর্ব্ব পদ-বিক্ষেপ করিতেছে। উহাদের অঙ্গ-ভঙ্গী দেখিয়া কি তোমার বোধ হইতেছে না যে, উহারা মনে মনে বিশ্ব-সংসার তুচ্ছ ভাবিতেছে। তৎ-পার্শ্বে দৃষ্টি কর, ক্রোধ নিজ কান্তা হিংসাকে সঙ্গে লইয়া, ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। উনি অভিমানের অত্যন্ত অনুগত। যদি কেহ

অভিমানকে স্পর্শমাত্র করে, ক্রোধ তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া,তাহার বৈর-নির্য্যাতন করিতে উদ্যত হয়। এদিকে অবলোকন কর, একটা প্রকাণ্ড রাক্ষস দেখিতে দেখিতে আপনার শরীর বৃদ্ধি করিয়া ফেলিল। এক্ষণেও যেরূপ স্থূলকায় হইয়া উঠিল, আমার বোধ হইতেছে, বিশ্ব-সংসার ভোজন করিলেও, উহার উদর পূর্ণ হয় না। উহার নাম কি জান? লোভ। বিশেষতঃ কাব্য-তরুতলে যে দুই প্রচণ্ড পিশাচ দণ্ডায়মান দেখিতেছ, উহাদের অত্যাচারে এ স্থানের অতিশয় অপযশ ঘোষণা হইয়াছে; উহাদের নাম কাম ও পান-দোষ। এককালে এই অপূর্ব্ব আনন্দ-কাননে নিষ্কলঙ্ক দম্পতী-প্রেমেরই প্রাদুর্ভাব ছিল; তৎকালে অনেকানেক প্রধান ধর্ম্ম তাঁহার সহচর ছিল, কোন দুষ্ক্রিয়া এ স্থানে প্রবেশ করিতেও সমর্থ হইত না। এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। দম্পতী-প্রেম ও তাঁহার সহচরদিগের দৈন্য-দশা উপস্থিত হইয়া পরানুরাগী কামরূপ পিশাচেরই আধিপত্য বৃদ্ধি হইতেছে। অবলোকন কর, পান-দোষ আপনার দল-বল-সহকারে কি অহিত আচরণ করিতেছে! কি বীভৎস বেশ ধারণ করিয়াছে! দেখ দেখ, তাহার ভয়ে ধর্ম্ম সকল ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। পশ্চাৎ হইতে আর কতকগুলি দুর্দ্দান্ত পিশাচ পিশাচী আসিয়া,তাহার সহিত বিকট হাস্য করিয়া নৃত্য করিতেছে। হে প্রিয়তম! এমত পরিশুদ্ধ পুণ্যধামে, এ প্রকার অবস্থা দেখিয়া, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যাহারা এই সমস্ত রাক্ষস পিশাচকে আশ্রয় দেয়, তাহারা তদ্দ্বারা আমাকেই প্রহার করে; আমি এ অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী হইয়া,স্বয়ং এরূপ ভূরি ভূরি অপ্রিয় ব্যাপার আর কত দেখাইব? ঐ ঘন-পল্লবাবৃত নিবিড় বৃক্ষের অন্তরালে যে এক পরমাসুন্দরী রমণীকে দৃষ্টি করিতেছ, উহার পর কুৎসিত স্ত্রী আর দ্বিতীয় নাই। উহার গাত্রে যে কত ব্রণ, কত ক্ষত ও কত কলঙ্ক আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। কেবল

কতকগুলি বেশভূষা-কল্পনা দ্বারা তৎসমুদায় প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, আপনাকে সজ্জীভূত করিয়া দেখাইতেছে, উহার নাম কপটতা।”

সমুদায় শ্রবণ ও দর্শন করিয়া আমি বিষাদ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইলাম, এবং মনে মনে চিন্তা করিলাম,—এ অসার সংসার স্বভাবতঃ শোক-দুঃখেতেই পরিপূর্ণ; যদিও দুই একটি সুখময় পুণ্যধাম ছিল, তাহাতে এত বিঘ্ন ঘটিয়াছে। যাহা হউক, আপনার কর্ত্তব্য-সাধনে পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নহে, এই বিবেচনা করিয়া, সর্ব্ব-দুঃখ-নিবারিণী সন্তাপ-নাশিনী বিদ্যাদেবীর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া গমন করিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গমনানন্তর একবার পশ্চাৎ অবলোকন করিয়া দেখি, যে সকল রাক্ষস-পিশাচের অহিত আচার দৃষ্টি করিয়া আসিলাম, তাহারাই আমার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে! বিশেষতঃ কাম ও পানদোষ এই দুই জন নানাবিধ সুমধুর প্ররোচনা-বাক্য বলিয়া, আমাকে তৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পূর্ব্বে যাহাদিগের অতিকুৎসিত বীভৎস আকার দর্শন করিয়াছিলাম, এখন দেখি, তাহারা পরম মনোহর রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছে। কি জানি, তাহারা কি কুমন্ত্রণা দেয়, এই আশঙ্কায় পরম-হিতৈষিণী বিদ্যাদেবীর সমীপবর্ত্তী হইয়া, সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিলাম। তৎক্ষণাৎ তিনি আমাকে অভয় দিয়া, ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা নামে দুই মহাবল পরাক্রান্ত প্রহরীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—“তোমরা দুই জনে ইহার দুই পার্শ্বে থাক, কোন শত্রু যেন ইহার নিকটস্থ হইতে না পারে।”

এইরূপে আমরা বনপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া, সম্মুখে এক ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখিতে পাইলাম। তখন বিদ্যা অতি প্রসন্ন-বদনে সুমধুর হাস্য করিয়া কহিলেন,—“এই ক্ষুদ্র প্রান্তরের শেষে যে মনোহর গিরি দর্শন করিতেছ ঐ তোমার লক্ষিত স্থান; ঐ স্থান প্রাপ্ত হইলেই তুমি চরিতার্থ হইবে।”

এই কথা শুনিয়া আমি পরম-পুলকিত-চিত্তে অরণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, চিরাকাঙ্ক্ষিত ফল-প্রত্যাশায় মহোৎসাহ-সহকারে দ্রুতবেগে পদবিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলাম, এবং অবিলম্বে পর্ব্বত-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, তথায় আরোহণ করিবার এক পথ প্রাপ্ত হইলাম। ঐ পথের এক পার্শ্বে এক দৃঢ়ব্রতা সুশীলা স্ত্রী এবং অন্য পার্শ্বে এক বহু পরিশ্রমী দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ পুরুষ দণ্ডায়মান আছেন; তাঁহারা যাত্রীদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া, পর্ব্বতোপরি লইয়া যাইতেছেন। তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম, স্ত্রীর নাম শ্রদ্ধা, আর পুরুষের নাম যত্ন।

ঐ পর্ব্বত আরোহণ করা অতিশয় ক্লেশকর বোধ হইল। অতি কষ্টে কিছু দূর গমন করিয়া, মনে মনে বিবেচনা করিলাম, সম্প্রতি এই স্থানে অবস্থিতি করি। বিদ্যাদেবী স্বকীয়া মহীয়সী শক্তিদ্বারা তাহা জানিতে পারিয়া কহিলেন—"হে প্রিয়তম! এ পর্ব্বতের পার্শ্ব-দেশে কোন স্থানে স্থির থাকিবার সম্ভাবনা নাই, যদি আর উপরে না উঠ, তবে অবশ্যই অধোগমন করিতে হইবে, অতএব সাবধান,—সাবধান।" আমি তাঁহার এই সদুপদেশ শুনিয়া, চৈতন্য প্রাপ্ত হইলাম। পরন্তু সুখের বিষয় এই যে, যতই আরোহণ করিতে লাগিলাম, ততই ক্লেশের লাঘব হইয়া সুখের বৃদ্ধি হইয়া আসিল।

অবশেষে যখন পর্ব্বতোপরি * উত্তীর্ণ হইলাম, তখন কি অনির্ব্বচনীয় অনুপম সুখানুভবই হইল। তথাকার সুশীতল মারুত-হিল্লোলে শরীর পুলকিত হইতে লাগিল। তথায় দ্বেষ, হিংসা, বিবাদ, বিসংবাদ, চৌর্য্য, অত্যাচার এ সকলের কিছুই নাই, কেবল আরোগ্য ও আনন্দ অবিরত বিরাজ করিতেছে। ইহা দেখিয়া, আমার অন্তঃকরণ অপার আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইল। বোধ হইল, বিশ্ব-সংসারে এমন রম্য স্থান আর দ্বিতীয় নাই

* ধর্ম্মাচলের উপর।

কিছুকাল ইতস্ততঃ ভ্রমণানন্তর দূর হইতে এক অপূর্ব্ব সরোবর দেখিতে পাইলাম এবং তদ্দর্শনার্থে আমার অত্যন্ত কৌতূহল উপস্থিত হইল। ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখি, কতকগুলি পরমপবিত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা সরোবর-তটে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহাদিগের অসামান্য রূপ-লাবণ্য, প্রফুল্ল পবিত্র মুখশ্রী এবং সারল্য ও বাৎসল্য স্বভাব অবলোকন করিয়া, অপরিমেয় প্রীতি লাভ করিলাম। আশ্চর্য্য এই যে, তাঁহাদিগের শরীরে কোন অলঙ্কার নাই, অথচ অনলঙ্কারই তাঁহাদের অলঙ্কার হইয়াছে। বোধ হইল যেন, আনন্দ-প্রতিমাগুলি ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়া, মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলাম, ইঁহারা দেব-কন্যা হইবেন, তাহার সংশয় নাই। তখন বিদ্যাদেবী সাতিশয় অনুকম্পা-পুরঃসর ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—"তুমি যথার্থ অনুমান করিয়াছ; ইঁহারা দেব-কন্যাই বটেন এবং এই ধর্ম্মাচল ইঁহাদের বাসভূমি। ইঁহাদের কাহারও নাম দয়া, কাহারও নাম ভক্তি, কাহারও নাম ক্ষমা, কাহারও নাম অহিংসা, কাহারও নাম মৈত্রী ইত্যাদি। সকলের নিজ নিজ গুণানুসারে নাম-করণ হইয়াছে। ইঁহাদের রূপ ভুবন-বিখ্যাত। ইঁহারা যে পর্য্যন্ত সুশীল, তাহা কি বলিব। বিদ্যারণ্য-যাত্রীদিগের মধ্যে যাঁহারা এই ধর্ম্মাচল আরোহণ করেন, তাঁহাদিগেরই শ্রম সফল ও জন্ম সার্থক। তুমি এই সরোবরে স্নান করিয়া শরীর স্নিগ্ধ ও জীবন পবিত্র কর।"

বিদ্যাদেবীর উপদেশানুসারে আমি উল্লিখিত শান্তি-সরোবরে অবগাহন করিয়া, অভূত-পূর্ব্ব অতি নির্ম্মল আনন্দ-নীরে নিমগ্ন হইতেছিলাম, ইতিমধ্যে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া দেখি, সেই সুন্দর মারুত-সেবিত যমুনা-কূলেই শয়িত রহিয়াছি।

কীটাণু।

উর্দ্ধদিকে অসীম নভোমণ্ডলে নয়ন নিক্ষেপ করিলে, বিশ্বপতির বিশ্ব-রাজ্যের সীমা-নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া, যেমন বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়, অধোদিকে দৃষ্টিপাত করিলেও মহীমণ্ডল-বাসী প্রজাপুঞ্জের সংখ্যাবধারণে সমর্থ না হইয়া, সেইরূপ চমৎকৃত হইতে হয়। গণ্ডার, মহিষ, হস্তী সিংহ প্রভৃতি যে সমস্ত বৃহৎকায় পশুর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ও দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রম প্রত্যক্ষ করিয়া ভয়ে ত্রস্ত হইতে হয়, তাহাদের সংখ্যা গণনা করা নিতান্ত অসাধ্য বোধ হয় না বটে, কিন্তু যে সমস্ত অতি সূক্ষ্ম অদৃশ্য কীট-পতঙ্গে পৃথ্বী-মণ্ডল পরিপূর্ণ রহিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা নিরূপণ করা মানবীয় বুদ্ধির সাধ্য নহে। তাহারা অতিসূক্ষ্ম, এই নিমিত্ত কীটাণু বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহাদের বৃত্তান্ত যেমন আশ্চর্য্য, বোধ হয়, লোক-প্রসিদ্ধ প্রচলিত উপন্যাস এবং কথা-সরিৎসাগর বা আরব্য উপন্যাসের অন্তর্গত অত্যদ্ভুত উপাখ্যান সমুদায়ও সেরূপ আশ্চর্য্য নহে।

যখন আমরা অণুবীক্ষণ-সহকারে কীটাণুবর্গ পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন বোধ হয়, আমরা অখিল বিশ্বেশ্বরের অন্য এক অত্যদ্ভুত অভিনব বিশ্বদর্শনে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন মনে হয়, যাহা কখন দেখি নাই, ভাবি নাই, স্বপ্নেও কখন কল্পনা করি নাই, তাহাই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে আরম্ভ করিলাম। কীটাণুগণের আকৃতি বিচিত্র, গতিবিধি বিচিত্র, ব্যবহারও বিচিত্র। তাহাদের সংখ্যার বিষয় বিবেচনা করিলে, বিস্ময়ার্ণবে নিমগ্ন হইতে হয়। সমুদায়ে কত প্রকার কীটাণু বিদ্যমান আছে, তাহা এক্ষণে নির্ব্বাচন করিবার সম্ভাবনা নাই। শত শত প্রকার এ কাল পর্য্যন্ত মানবজাতির নেত্রগোচর হইয়াছে; কোন প্রকার কীটাণু গোলাকৃতি, কোন প্রকার বা অণ্ডাকৃতি, কোন প্রকার বা মৎস্যাকৃতি,
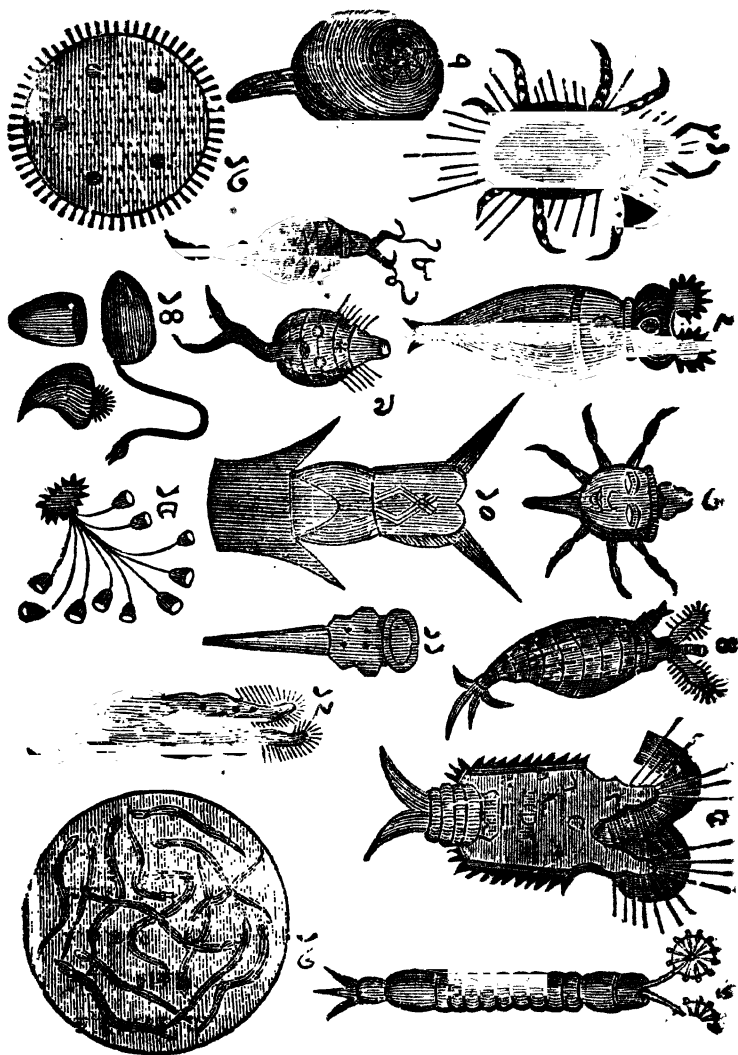
কোন প্রকার বা জলব্যাল-সদৃশ, কোন প্রকার বা কৃমি-সদৃশ, কোন প্রকার বা কেশাকৃতি কোন প্রকার বা দ্বিশিরাঃ, কোন প্রকার বা শৃঙ্গশালী, কোন প্রকার বা উদ্ভিদ্-সদৃশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কীটাণু-বিষয়ক চিত্র-ক্ষেত্রে যে কয় প্রকারের চিত্রময় প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল, তাহার অন্তর্গত তৃতীয়-সংখ্যক কীটাণুর আকৃতি মানব-জাতির মুখ-মণ্ডলের অবিকল অনুরূপ বলিয়া বোধ হয়।* নর-মুখাকৃতি কীট কুত্রাপি বিদ্যমান আছে, বোধ হয়, ইহা কোন ব্যক্তির কল্পনা-পথেও কদাচ উপস্থিত হয় নাই।

কীটাণুর আকৃতি অত্যন্ত ক্ষুদ্র; এ নিমিত্ত যন্ত্র-সহকার-ব্যতিরেকে প্রায় দৃষ্টি-গোচর হয় না। সামান্য জলে এমন সূক্ষ্ম-কায় কীটাণু আছে যে, তাহার কোটি কোটিটা একত্র করিলেও, এক বালুকা-কণার সমান

* এই তৃতীয়-সংখ্যক কীটাণুর পৃষ্ঠদেশ মনুষ্যের মুখ-মণ্ডল-সদৃশ আচ্ছাদন-বিশেষে আচ্ছাদিত। উহার ছয় পা, এক পুচ্ছ। দ্বিতীয়-সংখ্যক কীটাণুর শিরো-ভাগে যে দুইটি অসামান্য অঙ্গ-বিশেষ দৃষ্ট হয়, তাহা কখন কখন মণ্ডলাকৃতি, কখন কখন অর্দ্ধ-মণ্ডলাকৃতি হইয়া থাকে। ঐ দুই চক্রের প্রান্তভাগে কতকগুলি সূত্র আছে, তাহা কখন কখন অত্যন্ত কম্পিত ও কখন কখন সত্বর ঘূর্ণিত হইতে থাকে। এই কীটাণুরা নানাপ্রকার রূপ ধারণ করে, তন্মধ্যে একপ্রকার রূপের প্রতিরূপ সপ্তম সংখ্যায় চিহ্নিত হইয়াছে। ষষ্ঠ-সংখ্যক কীটাণুর মস্তকোপরি দুইখানি গোলাকার জাল আছে। উহারা ঐ জালদ্বয় বিস্তার করিয়া, খাদ্যবস্তু সঙ্কলন করে। কিন্তু যখন জাল বিস্তার না করে, তখন সুতীক্ষ্ণ শৃঙ্গ-দ্বয় বাহির করিয়া, অন্যপ্রকার অদ্ভুত আকার ধারণ করে। দশম সংখ্যায় তাহার প্রতিরূপ প্রকটিত হইল। চতুর্থ-সংখ্যক কীটাণুর মুখদেশে দুই দিকে দুই লোমাবলি-বিশিষ্ট ওষ্ঠ আছে। তাহারা মধ্যে মধ্যে ঐ ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্যস্থল হইতে এক শুণ্ড এবং বক্ষঃস্থল হইতে ভৃঙ্গারের নল-তুল্য অঙ্গবিশেষ বহির্গত করিয়া দেয়। দ্বাদশ-সংখ্যক কীটাণুর মুখভাগ তাহার সমগ্র শরীরের অর্দ্ধেক হইবে। চতুর্দ্দশ-সংখ্যায় একজাতীয় কীটাণুর তিন প্রকার রূপ আলিখিত হইয়াছে। ত্রয়োদশ সংখ্যক কীটাণু সম্পূর্ণ গোলাকার। তাহার মস্তকও নাই, পুচ্ছও নাই, পাখাও নাই, কিন্তু ঊর্দ্ধ কি অধোভাগ আবর্তন করিতে করিতে গমন করে, কখনও লাটিমের ন্যায় ঘূর্ণিত হইতে থাকে, কখন আবার অবলীলাক্রমে সহজে চলিয়া যায়।

হয় না; সহস্র সহস্রটা, অতিসূক্ষ্ম সূচিকার ছিদ্র-প্রমাণ স্থানে একত্র সন্তরণ করিতে পারে। যে কীটাণু এত বড় যে, দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও উচ্চতায় এক বুরুল-প্রমাণ স্থানে দশ কোটির অধিক থাকিতে পারে না, কীটাণুর মধ্যে তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত বৃহৎকায় বলিতে হয়; কিন্তু তাহাদেরও আকৃতি যেরূপ সূক্ষ্ম, তাহাই বা কে অনুভব করিতে পারে? উল্লিখিত-রূপ এক বুরুলকে এক ঘন বুরুল বলে; এক ঘন বুরুল-প্রমাণ স্থানে যদি ১০,০০,০০,০০০ দশ কোটি কীটাণু অবস্থিতি করিতে পারে, তবে এক ঘন ক্রোশে ২৯, ৮৫, ৯, ৮৪, ০০, ০০, ০০, ০০, ০০, ০০, ০০, ০০০ উনত্রিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার নয় শত চৌরাশি পরার্দ্ধ কীটাণু অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয়, তাহার সন্দেহ নাই। যদি কোন ব্যক্তি প্রতি দিবস এক কোটি করিয়া গণনা করিতে পারে, তথাচ তাহার সমুদায় গণনা করিতে ৮, ১৮, ০০, ০০, ০০, ০০, ০০০ আট শঙ্খ এক মহাপদ্ম আট নিখর্ব্ব অপেক্ষাও অধিক-সংখ্যক বৎসর অতীত হইয়া যাইবে। যদি এক ক্রোশ-প্রমাণ স্থানে এইরূপ অসংখ্য-প্রায় কীটাণুর নিবাস হইল, তবে সমগ্র ভূমণ্ডলে কত কীটাণু বিদ্যমান আছে, তাহা কে অনুভব করিতে পারে? নদ, হ্রদ, সমুদ্র, সরোবর, তড়াগ প্রভৃতি সমুদায় জলাশয় এবং প্রায় সর্ব্ব-প্রকার বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্ম ও পুষ্প তাহাদিগের বাস-স্থল। যে স্থান সহসা জীব-শূন্য অকর্ম্মণ্য বোধ হয়, অণুবীক্ষণ সহকারে তাহা প্রাণি-পুঞ্জে পরিপূর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে স্থান আপাততঃ গতি ও ক্রিয়া-বিবর্জ্জিত বোধ হয়, অণুবীক্ষণ-সহকারে, সেস্থানে কোটি কোটি কীটাণু সতত সঞ্চরণ করিতেছে, দৃষ্টি করা যায়। যে স্থলে আপাততঃ সচেতন পদার্থের সম্পর্ক মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না, অণুবীক্ষণ-সহকারে তাহা সুখ ও সন্তোষের আধার-রূপে প্রতীয়মান হয়। উল্লিখিত দৃষ্টি-যন্ত্র-সহকারে স্থানে স্থানে যে সমস্ত মৃত কীটাণু দৃষ্ট হইয়াছে, তাহার সংখ্যার বিষয় বিবেচনা করিলে,

বিস্ময়ার্ণবে নিমগ্ন হইয়া হত-জ্ঞান হইতে হয়। কত শত গ্রাম, নগর ও শস্যক্ষেত্রের মৃত্তিকা কীটাণু-শবে সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ। দেশ-বিশেষের সুপ্রশস্ত ভূমিখণ্ড কেবল কীটাণু-পঞ্জরেই প্রস্তুত। কত কত উন্নত পর্ব্বত কীটাণু-পুঞ্জের পঞ্জর-রাশি ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়।

কীটাণুগণের গতিবিধি ক্রিয়াদিও সাতিশয় বিচিত্র। কতকগুলি কীটাণু নির্জ্জীব পরমাণুবৎ চিরজীবন এক স্থানেই অবস্থিতি করে। কতকগুলি আবার কিছু দিন ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া, উত্তর কালে এক-স্থানে স্থাবরবৎ স্থির হইয়া থাকে। অবশিষ্ট কতকগুলি স্বেচ্ছানুসারে সর্ব্বদিকেই গমনাগমন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। অনেক-বিধ কীটাণু আলোকময় স্থানে অবস্থান করে, কিন্তু বহুপ্রকার আবার ঘোর-তর অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়া, সমস্ত জীবন ক্ষেপণ করে। কতকগুলি মাংসাশী; তাহারা আপন অপেক্ষায় ক্ষুদ্রতর অন্য জাতিকে হনন করিয়া, ভোজন করে। অপর কতকগুলি নিরামিষ-ভোজী; তাহারা অতি সূক্ষ্ম উদ্ভিদ্ পদার্থ আহার করিয়া জীবিত থাকে। এই সমস্ত সূক্ষ্ম জীবের, পশু পক্ষী মৎস্যের ন্যায় পদ, পক্ষ ও পাখ্না নাই, অথচ অনেকে অতি সত্বর গমনাগমন করিয়া থাকে। * অনেক প্রকার কীটাণু জন্মান্ধ, অথচ অন্য পশু সন্নিহিত হইলে, অনায়াসে বুঝিতে পারে; এবং অন্যজাতীয় জীবকে আক্রমণ ও হনন করিয়া ভক্ষণ করে। ইহাদের জন্মমৃত্যুও অসামান্য নিয়মানুসারে নির্ব্বাহিত হয়। বৃক্ষের শাখায় যেমন কলিকা উৎপন্ন হয়, কোন কোন কীটাণুর সন্তান সেইরূপ তাহাদের গাত্রোপরি উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর কতকগুলি কীটাণুর শরীর আপনা আপনি বিভক্ত হইয়া, এক এক ভাগ এক একটি স্বতন্ত্র প্রাণী হইয়া উঠে। কোন কোন

* তাহাদের গাত্রে নেত্র-রোম-সদৃশ কতকগুলি তন্তু থাকে। তদ্দ্বারা তাহারা গতায়াত করে।

জাতির জন্ম মৃত্যু সুখ সম্ভোগ সমুদায় ২।৪ দুই চারি ঘণ্টার মধ্যেই নির্ব্বাহিত হয়। কোন কোন জাতিরা ২০।২৫ বিশ পঁচিশ দিবস জীবিত থাকে। কীটাণুগণ যে জলাশয়ে অবস্থিতি করে, তাহা শুষ্ক হইলে, উহাদের কলেবর ধূলি-কণাবৎ পরিশুষ্ক হইয়া পতিত থাকে। কিন্তু তিন চারি বৎসর পরেও যদি তাহাতে জল স্পর্শ হয়, তবে ঐ সমস্ত মৃতবৎ দেহ তৎক্ষণাৎ পুনর্জ্জীবন পাইয়া, ইতস্ততঃ সঞ্চরণ ও কুর্দ্দন করিতে আরম্ভ করে। মৃত দেহে পুনর্ব্বার জীবন-সঞ্চারের বিষয় অবাস্তবিক উপন্যাসের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। বিশ্বপতির বিশ্বমধ্যে সর্ব্বস্থানেই যে আবহমান-কাল তদনুরূপ ঘটনা ঘটিয়া আসিতেছে, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়।

আমরা স্থূল সূক্ষ্ম, সজীব নির্জ্জীব, স্থাবর জঙ্গম যে কোন পদার্থে নেত্রপাত করি, তাহাতেই মহিমার্ণব মহেশ্বরের অপরিসীম মহিমা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। একদিকে দূরবীক্ষণ-সহকারে নভো-মণ্ডল-বিক্ষিপ্ত দীপশিখা-সদৃশ প্রতীয়মান প্রত্যেক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল এক এক প্রকাণ্ড জীব-লোক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে; অন্য দিকে অণুবীক্ষণ-সহকারে এক এক বিন্দু-প্রমাণ স্থানে এক এক বিশালতর জীব-লোকের ব্যাপার প্রত্যক্ষ হইতেছে। এক দিকে দূরবীক্ষণ-প্রদর্শিত সংখ্যাতীত গ্রহ-নক্ষত্রা-দির সহিত তুলনা করিলে, পৃথিবী এক বালুকা-কণা অপেক্ষাও অকিঞ্চিৎ-কর পদার্থ বলিয়া প্রতীত হয়; অন্য দিকে অণুবীক্ষণ-সহকারে প্রত্যেক বনের পত্রমধ্যে, প্রত্যেক উপবনের কুসুমমধ্যে ও প্রত্যেক জলাশয়ের জল-মধ্যে জীব-পরিপূর্ণ, সংখ্যাশূন্য, জীব-লোকের ব্যাপার দিবানিশি সম্পন্ন হইতে দৃষ্ট হইতে থাকে। আমরা দূরবীক্ষণ-সহকারে নভো-মণ্ডলে যত দূর দৃষ্টিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তদপেক্ষা দূরতর প্রদেশে বিশ্ব-স্রষ্টার জ্ঞান, শক্তি, মহিমা ও করুণার অসংখ্য নিদর্শন অলক্ষিত রহিয়াছে, এ

বিষয়ে যেমন সংশয় হইবার বিষয় নাই, সেইরূপ এক্ষণে অত্যুত্তম অণু-বীক্ষণ-সহকারেও যে স্থানে অতি সূক্ষ্ম কীটাণু পর্য্যন্ত লক্ষিত হয় না, তাহাও মনুষ্যকৃত সর্ব্ববিধ দৃষ্টি-যন্ত্রের অলক্ষ্য অদৃষ্টি-গোচর জীবপুঞ্জের অধিষ্ঠান-ভূমি হইবে, ইহাতে অসম্ভব কি? কি আশ্চর্য্য! এক এক অণু-প্রমাণ স্থানে কতই বিস্ময়কর ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে, কতই সুখ ও সন্তোষ সঞ্চারিত হইতেছে, বিশ্বপতির কতই অবিনশ্বর কীর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। গগন-বিক্ষিপ্ত জ্যোতিষ্কগণের সংখ্যা পর্য্যালোচনা করিয়া, অন্তঃকরণ অবিচলিত রাখা যদি কখন সম্ভব হয়, তথাচ সমুদ্র-নিবাসী কীটাণুগণের সংখ্যা স্মরণ হইলে, চিত্তভূমি বিচলিত ও শিরোদেশ বিঘূর্ণিত না হইয়া পার পাইবার সম্ভাবনা নাই। হে মহিমার্ণব! তোমার এ কীদৃশ মহিমা!

মিত্রতা।

সঙ্গলাভের বাসনা আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ এবং সমস্ত সদ্‌গুণ আমাদের আদরণীয়। কাহারও কোন সদ্‌গুণ সন্দর্শন করিলে, তাহার প্রতি অনুরাগ-সঞ্চার হয়, এবং অনুরাগ-সঞ্চার হইলেই, তাহার সহিত সহবাস করিবার বাসনা উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে একজনের প্রতি অন্য জনের শ্রদ্ধা ও প্রীতির উদ্রেক হইতে পারে; কিন্তু উভয়ের সমান ভাব না হইলে, প্রকৃতরূপ বন্ধুত্ব-ভাবের উৎপত্তি হয় না। সমান ভাব ও সমান অবস্থা সদ্ভাব-সঞ্চারের মূলীভূত। এই হেতু, বালকের সহিত বালকের, যুবার সহিত যুবার এবং প্রাচীনের সহিত প্রাচীন ব্যক্তির সৌহৃদ্য-ভাব সহজে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এই হেতু পণ্ডিতের সহিত পণ্ডিত লোকের, অজ্ঞের সহিত অজ্ঞ লোকের, সাধুর সহিত সাধু লোকের, এবং অসাধুর সহিত

অসাধু লোকের মিত্রতা-ভাব অক্লেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই হেতু ধনীর সহিত ধনী লোকের, দুঃখীর সহিত দুঃখী লোকের এবং মধ্য-বিত্তের সহিত মধ্য-বিত্ত লোকের অপেক্ষাকৃত অধিক সৌহৃদ্য সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ মানসিক প্রকৃতির সাম্যভাবই বন্ধুত্ব-গুণোৎপত্তির প্রধান কারণ। যে সমস্ত সুচরিত্র ব্যক্তির মনোবৃত্তি একরূপ হয়, সুতরাং এক বিষয়ে প্রবৃত্তি ও এক কার্য্যে অনুরক্তি জন্মে, তাঁহাদেরই পরস্পর প্রকৃতরূপ মিত্রতা লাভের সম্ভাবনা।

কিন্তু মেদিনী-মণ্ডলে দুই ব্যক্তির সর্ব্ববিষয়ে সমান হওয়া সম্ভব নয়। যাহাদের জ্ঞান সমান, তাহাদের অবস্থা সমান নয়। যাহাদের অবস্থা সমান, তাহাদের ধর্ম্ম সমান নয়। যাহাদের ধর্ম্ম সমান, তাহাদের প্রবৃত্তি সমান নয়। যাহাদের প্রবৃত্তি সমান, তাহাদের সম্পত্তি সমান নহে। অনৈক্য ঘটনার এইরূপ অশেষবিধ হেতু বিদ্যমান থাকাতে, এক ব্যক্তির সহিত অন্য ব্যক্তির সমস্ত বিষয়ে মিলন হয় না; সুতরাং সম্পূর্ণরূপে সৌহৃদ্য-ভাবও উৎপন্ন হয় না। যে বিষয়ে যাহাদের অন্তঃকরণের ঐক্য হয়, তাহাদের সেই বিষয় অবলম্বন করিয়া সদ্ভাব হইতে পারে, এবং যে পর্য্যন্ত অন্য বিষয়ে বৈষম্যভাব উপস্থিত না হয়, সে পর্য্যন্ত সেই সদ্ভাব স্থায়ী হইতে পারে। যাঁহার সহিত কিয়ৎ বিষয়ে ঐক্য হয়, আমরা এ সংসারে তাঁহাকেই বন্ধুত্ব-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, মনের ক্ষোভ নিবারণ করি। এরূপ বন্ধুও অতি দুর্লভ।

আমরা যাদৃশ বন্ধু-লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হই, যদিও তাদৃশ বন্ধু ধরণী-মণ্ডলে নিতান্ত দুর্লভ, তথাচ বন্ধু-ব্যতিরেকে জীবিত থাকা দুঃসহ ক্লেশের বিষয়। কোন জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত-শিরোমণি * উল্লেখ করিয়াছেন, বন্ধু-ব্যতিরেকে সংসার একটি অরণ্য মাত্র। অপর এক

* বেকন্।

মহাত্মা * নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বন্ধু-হীন জীবন আর সূর্য্য-হীন জগৎ উভয়েই তুল্য। তৃতীয় এক ব্যক্তি + লিখিয়া গিয়াছেন, সংসার-রূপ বিষ-বৃক্ষে দুইটি সুরস ফল বিদ্যমান আছে, কাব্যরূপ অমৃত-রসের আস্বাদন ও সজ্জনের সহিত সমাগম। যিনি দুঃখের হস্তে পতিত হইয়াও বন্ধুজনের দর্শন পান, দুঃখ কি কঠোর পদার্থ, তিনি তাহা অবগত নহেন। যিনি বন্ধুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, সম্পৎ-সুখ সম্ভোগ করেন, বন্ধু-ব্যতিরেকে বিষয়-সম্পত্তি কেমন অকিঞ্চিৎকর, তাহাও তাঁহার প্রতীত হয় নাই। বন্ধু শব্দ যেমন সুমধুর, বন্ধুর রূপ তেমনি মনোহর। বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাপিত চিত্ত শীতল হয়, এবং বিষণ্ণ বদন প্রসন্ন হয়। প্রণয়-পবিত্র সচ্চরিত্র মিত্রের সহিত সহবাস ও সদালাপ করিয়া যেমন পরিতোষ জন্মে, তেমন আর কিছুতেই জন্মে না। তাঁহার সহিত সহসা সাক্ষাৎকার হইলে, কি জানি কি নিমিত্ত শোক-সন্তপ্ত সুদুঃখিত ব্যক্তিরও অধরযুগলে মধুর হাস্যের উদয় হয়। দীর্ঘকাল অনশনের পর অন্নভোজন করিলে যেরূপ তৃপ্তি জন্মে, পিপাসায় শুষ্ক-কণ্ঠ হইয়া সুশীতল জল পান করিলে যেরূপ সুখানুভব হয়, এবং তপন-তাপে তাপিত হইয়া, সুবিমল সুস্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করিলে, অঙ্গ-সন্তাপ দূরীকৃত হইয়া যেরূপ প্রমোদ-লাভ হয়, সেইরূপ প্রিয় বন্ধুর সুমধুর সান্ত্বনা-বাক্য দ্বারা দুঃখিত জনের মনের সন্তাপ অন্তরিত হইয়া, সন্তোষসহ প্রবোধ-সুধার সঞ্চার হয়।

বন্ধুত্ব-গুণের প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। উহা এমন মনোহর বিষয় যে, শত শত গ্রন্থকার উহার মাধুর্য্য ও মনোহারিত্ব বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু কেহই তদ্বিষয়ে মনের ক্ষোভ নিবারণ করিতে সমর্থ হন নাই। ফলতঃ এস্থলে আমাদের মিত্রতা-ঘটিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিবরণ করা যত আবশ্যক, মিত্রতার গুণ বর্ণন করা তত আবশ্যক নয়।

*সিসিরো। + হিতোপদেশ-কর্ত্তা।

কাহারও সহিত মিত্রতা-সূত্রে বদ্ধ হইবার সময়ে কিরূপ অনুষ্ঠান করা উচিত; তৎপরে যত কাল তাঁহার সহিত মিত্রতা থাকে, ততকাল কিরূপ আচরণ করা বিধেয়; পরিশেষে যদি বিচ্ছেদ ঘটে, তাহা হইলেই বা কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য; এই ত্রিবিধ কর্ত্তব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ক্রমে ক্রমে লিখিত হইতেছে।

প্রথমতঃ। জ্ঞানবান্ সচ্চরিত্র ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের সহিত মিত্রতা করা কর্ত্তব্য নয়। সাধু-সঙ্গ যেমন গুণ-কারী, অসাধু-সঙ্গ তেমনি অগুণ-কারী—ইহা প্রসিদ্ধই আছে। বন্ধুর দোষে আমাদের চরিত্র দূষিত হয়। আমরা যে ব্যক্তিকে একান্ত ভালবাসি ও যাঁহার সহিত সর্ব্বদা সহবাস করি, তাঁহার দোষ-সমুদায়কে দোষ বলিয়া বিবেচনা করি না; প্রত্যুত, তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া, তদনুরূপ অসদাচরণ করিতেই প্রবৃত্ত হই। তাঁহার দোষ-সমুদায় আমাদিগের এমন অক্লেশে অভ্যাস পায় যে, জানিতে পারিলেও পারি না, কিরূপে অভ্যাস হইল। অতএব যখন আমাদের গুণাগুণ ও সুখ-দুঃখ মিত্রের গুণাগুণের এত সাপেক্ষ, তখন যে ব্যক্তিকে সচ্চরিত্র ও সদ্বিবেচক বলিয়া নিশ্চয় না জানা যায়, তাঁহার সহিত মিত্রতা করা কোনরূপেই শ্রেয়স্কর নয়। যাঁহার বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি উভয়ই বলবতী, তাঁহারই সহিত মিত্রতা করা কর্ত্তব্য।

মিত্রের দোষে চিরজীবন দুঃখ পাইবার সম্ভাবনা এবং মিত্রের গুণে চিরজীবন সুখী হইবার সম্ভাবনা। যে দুষ্কর্ম্মশালী দুঃশীল ব্যক্তির সহিত কিছুদিন মিত্রতা থাকিয়া বিচ্ছেদ হইয়া যায়, তাহারও সেই অল্প কালের সংসর্গ-দোষে আমাদের চরিত্র এমন দূষিত হইতে পারে যে, জন্মের মত দোষী থাকিয়া, অশেষ-বিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া কাল হরণ করিতে হয়। যদি কিয়ৎক্ষণ হাস্য-কৌতুক ও প্রমোদ-সম্ভোগ মাত্র বন্ধুত্ব-করণের উদ্দেশ্য হইত, তবে, কেবল পরিহাস-পটু সুরসিক ব্যক্তি দেখিয়া, তাঁহারই সহিত

বন্ধুত্ব করিতাম) যদি কাহারও নিকট কিছু সাংসারিক উপকার প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে শিষ্টতা ও সৌজন্য-প্রকাশ মাত্র বন্ধুত্ব-করণের প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে, কেবল উদার-স্বভাব ঐশ্বর্য্যশালী অথবা ক্ষমতাপন্ন পদস্থ ব্যক্তি দেখিয়া তাঁহারই সহিত বন্ধুত্ব করিতাম। যদি লোক-সমাজে মান্য লোকের মিত্র বলিয়া গণ্য হওয়া বন্ধুত্ব-করণের অভিসন্ধি হইত, তাহা হইলে, কোন লোক-মান্য বিখ্যাত ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব করিবার জন্য, অথবা কথঞ্চিৎ লোকের নিকট তাঁহার বন্ধু বলিয়া পরিচিত হইবার নিমিত্ত অশেষ মত চেষ্টা পাইতাম। কিন্তু যদি মিত্রের সহিত মিত্রের মনোমিলনের নাম মিত্রতা হয়, যদি মিত্রের ক্লেশে ও মিত্রের বিপদে বিপন্ন হওয়া বিধেয় হয়, যদি মিত্রের দোষ গোপন করিয়া সুস্পষ্ট পক্ষপাত-দোষে দূষিত হওয়া আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ হয়, যদি পাপিষ্ঠ মিত্রের সংসর্গ-বশতঃ পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অনুরক্তি হওয়া সম্ভাবিত হয়, যদি বন্ধুজনের কদাচার-জনিত কলঙ্ক শুনিয়া লজ্জিত ও সন্তপ্ত হওয়া অকপট-হৃদয় সুহৃদ্‌বর্গের প্রকৃতি-সিদ্ধ হয়, তবে কাহারও সহিত মিত্রতা-গুণে বদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, তাঁহার গুণ ও চরিত্র যত্নপূর্ব্বক নিরূপণ করা কর্ত্তব্য, তাহার সন্দেহ নাই। যিনি তোমার সহিত আত্মীয়তা করিবার বাসনা করেন, তিনি আপনি আপনার আত্মীয় কি না, বিচার করিয়া দেখ।

ধরণী-মণ্ডলে ধর্ম্ম-ব্যতিরেকে আর কিছুই স্থায়ী নহে। ধর্ম্ম যে মিত্রতার মূলীভূত নয়, তাহা কদাচ স্থায়ী হয় না। বন্ধু যেমন বিশ্বাস-স্থল, এমন আর কেহই নয়। কিন্তু অপাত্রে বিশ্বাস করিলে, অবিলম্বেই প্রতিফল পাইতে হয়। যে ব্যক্তি স্বার্থ-লাভ-প্রত্যাশায় কাহারও সহিত মিলন করে, যদি বন্ধুজন-সম্পর্কীয় কোন গুহ্য কথা ব্যক্ত করিলে, স্বার্থ-লাভ হয়, তবে সে কথা কেন না প্রকাশ করিবে? যে ব্যক্তি অধর্ম্মা-চরণ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হয় না, সে বন্ধুজন-সমীপেই বা

বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতে কেন কুণ্ঠিত হইবে? যে ব্যক্তি আমাদের আকস্মিক দারিদ্র্য-দশা উপস্থিত দেখিয়া, আমাদের নিকট উপকার-প্রত্যাশা রহিত হইল বলিয়া, চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হয়, সে ব্যক্তি আমাদের দুঃখানলে সান্ত্বনা-সলিল সেচন করিতে কেন ব্যগ্র হইবে? এমন ব্যক্তি যদি আমাদের অপযশ ঘোষণা করিয়া স্বার্থ লাভ করিতে পারে, তবে আমাদিগের চরিত্রে অসত্য কলঙ্ক আরোপণ-পূর্ব্বক সুখ্যাতি লোপ করিতেই বা কেন পরাঙ্মুখ হইবে? অনেক ব্যক্তি বিশ্বাস-ঘাতক বন্ধুর বিষম অত্যাচার-জনিত দুঃসহ ক্লেশে কাতর হইয়া থাকেন, এ কথা যথার্থ বটে, কিন্তু ঐ ক্লেশ কেবল সেই বন্ধুর দোষে নয়, নিজ দোষেও উৎপন্ন হইয়া থাকে। অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করাতেই তাঁহাকে ঐ প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়। বন্ধুত্ব ঘটনার প্রারম্ভ-সময়ে যে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করা উচিত, তাহা না করাতেই, উক্তরূপ ক্লেশ-পরম্পরা ভোগ করিতে হয়। অতএব, অসাধু লোকের সহিত বন্ধুতা করা কোনরূপেই শ্রেয়স্কর নয়। সদ্বিদ্যাশালী সচ্চরিত্র দেখিয়া বন্ধু করিবে।

দ্বিতীয়তঃ। যে সময়ে কোন ব্যক্তিকে মিত্র বলিয়া অবধারণ করা যায়, সেই সময় অবধি তৎসংক্রান্ত কতকগুলি অতি মনোহর অভিনব ব্রতে আমাদিগকে ব্রতী হইতে হয়। সেই সমুদায় পবিত্র ব্রতই বা কি, এবং কিরূপেই বা পালন করিতে হয়, পশ্চাৎ তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইতেছে। যত কাল তাঁহার সহিত মিত্রতা থাকে, তাবৎ তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার সম্পাদন করিতে হয়, তাহা অগ্রে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। তাঁহার বিচ্ছেদ বা প্রাণত্যাগ-জনিত সুদারুণ শোক-সন্তাপ যদি আমাদের ভাগ্যে ঘটে, তাহা হইলে, তৎপরে যাবৎ কাল জীবিত থাকিতে হয়, তাবৎ কাল তদীয় সদ্ভাব-সংক্রান্ত যে যে নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য, তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে।

আমরা যাঁহার সহিত যথা-নিয়মে বন্ধুত্ব-বন্ধনে বদ্ধ হই, তাঁহাকে অসঙ্কুচিত-চিত্তে অব্যাহতভাবে বিশ্বাস করা প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যখন আমরা তাঁহাকে নিতান্ত বিশ্বাস-ভাজন বিবেচনা করিয়া, তাঁহার সহিত সৌহৃদ্য-রূপ বিশুদ্ধ ব্রত অবলম্বন করিয়াছি তখন, তাঁহার নিকট অকপট-হৃদয়ে হৃদয়-কবাট উদ্ঘাটন করা, সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রোমক-দেশীয় কোন নীতি-প্রদর্শক * নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "তুমি যাঁহাকে আত্মবৎ বিশ্বাস না কর, তাঁহাকে যদি বন্ধু বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাক, তবে তুমি বন্ধুত্ব-গুণের প্রকৃত প্রভাব প্রতীতি করিতে সমর্থ হও নাই; তুমি যাঁহার প্রতি অনুরক্ত হও, তিনি তোমার হৃদয়-নিলয়ে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত কি না, দীর্ঘকাল বিবেচনা করিবে। কিন্তু যখন বিচার করিয়া, তাঁহাকে যথার্থরূপ উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিবে, তখন তাঁহাকে অন্তঃকরণের অভ্যন্তরে স্থান প্রদান করিবে।" বাস্তবিক মিত্র-সদৃশ প্রত্যয়-স্থল আর কেহই নাই। প্রকৃত মিত্রের অকপট হৃদয় বিশ্বাস-রূপ পরম পদার্থের জন্ম-ভূমি বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। তাঁহার হস্তে ধন-প্রাণাদি সমুদায়ই বিশ্বাস করিয়া অর্পণ করা যায়। কোন বিষয়ই তাঁহার নিকট গোপন রাখিবার বিষয় নয়। যে বিষয় পিতার নিকট ব্যক্ত করিতে শঙ্কা উপস্থিত হয়, ভ্রাতার নিকট প্রকাশ করিতে সংশয় জন্মে, এবং ভার্য্যা-সমীপেও সময়-বিশেষে গোপন রাখিতে হয়, মিত্র-সন্নিধানে তাহা অসঙ্কুচিত-চিত্তে অক্লেশে ব্যক্ত করা যায়।

যে ব্যক্তি একান্ত প্রীতি-ভাজন ও নিতান্ত বিশ্বাস-পাত্র, তাঁহার কল্যাণ-সাধন-বিষয়ে সহজেই অনুরাগ হইয়া থাকে, এবং বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তদর্থে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হয়; তাঁহার যদি কোন বিষয়ের অপ্রতুল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, সে অপ্রতুল-

* সেনেকা।

পরিহারার্থ সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যদি তিনি শোক-সন্তাপে সন্তপ্ত হন, তাহা হইলে, প্রীতি-বচন ও স্নেহ-বিতরণ দ্বারা সেই সন্তাপের শান্তি করিতে সযত্ন হওয়া উচিত। যদিও আমরা তাঁহার শোক-দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তি করিতে সমর্থ না হই, তথাচ কিছু না কিছু শমতা করিতে পারি, তাহার সন্দেহ নাই। কখন কখন প্রণয়-পবিত্র প্রবোধ-বচন দ্বারা তাঁহার দুঃখের উপর সুখের ছায়া পাতিত করিয়া, শোকের বিষয় কিয়ৎক্ষণ বিস্মৃত রাখিতে পারি। যদি তিনি নিরপরাধে লোকের নিকট নিন্দিত হন, তাহা হইলে, আমরা তাঁহাকে নির্দ্দোষ জানিয়া প্রবোধ দিতে ও তাঁহার মিথ্যাপবাদ-জনিত মানসিক গ্লানির শমতা করিতে সমর্থ হই; এবং জন-সন্নিধানে তদীয় নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে চেষ্টা পাইতে পারি। তাঁহার উল্লিখিতরূপ অশেষপ্রকার উপকার সম্পাদন করা, আমাদের উচিত কর্ম্ম। তাঁহার উপকার-সাধনে সযত্ন ও সমর্থ হওয়া, আমাদের সুখের কার্য্য ও সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

বন্ধুর পাপাঙ্কুর উৎপাটন করা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমরা তাঁহার যত প্রকার উপকার সাধন করিতে পারি, তন্মধ্যে কোন প্রকারই উহার তুল্য কল্যাণকর নয়। মনুষ্যের পক্ষে কোন পদার্থ ধর্ম্ম অপেক্ষায় হিতকারী নহে; অতএব হৃদয়াধিক প্রিয়তম সুহৃজ্জনের হত-প্রায় ধর্ম্ম-রত্ন উদ্ধার করিয়া দেওয়া অপেক্ষা অন্য কোন প্রকারে তাঁহার অধিকতর উপকার করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। যে সময় যাঁহাকে বন্ধুত্ব-পদে বরণ করা যায়, সে সময়ে তিনি যথার্থ সচ্চরিত্র থাকিলেও, পরে অসচ্চরিত্র হওয়া অসম্ভব নহে। মনুষ্যের মন নিরন্তর একরূপ থাকা সহজ নয়; পুণ্য-পদবীতে ভ্রমণ করিতে করিতে, দৈবাৎ পদ-স্খলন হইয়া, বিপথগামী হইবার সম্ভাবনা আছে। বন্ধুজনের এতাদৃশ

অকল্যাণকর বিড়ম্বনা ঘটিলে, তাঁহাকে পুণ্য-পথে পুনরানয়ন করিবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে যত্ন করা কর্ত্তব্য। পাপাসক্ত ব্যক্তিকে হিত-বাক্য কহিলে, কি জানি সে বিপরীত ভাবিয়া রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হয়, এই বিবেচনায় অনেকে মিত্রগণের দোষ সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হন না; কিন্তু তাঁহাদের এরূপ ব্যবহার উচিত ব্যবহার নয়। পীড়িত ব্যক্তি কটু ও তিক্ত ঔষধ ভক্ষণ করিতে সম্মত না হইলেও, তাহাকে ঐ সমুদায় রোগনাশক সামগ্রী সেবন করান যেমন অবশ্যই কর্ত্তব্য, অধর্ম্ম-স্বরূপ মানসিক রোগে রুগ্ন ব্যক্তিকেও উপদেশ-ঔষধ সেবন করান, সেইরূপ অবশ্যই কর্ত্তব্য ও পুণ্য কর্ম্ম। সে বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইলে, বন্ধুত্ব-ব্রত লঙ্ঘন করা হয়। তাঁহার সন্তোষ সাধন ও রোগোৎপত্তি-নিবারণ-উদ্দেশে মৃদুবচনে সুমধুর-ভাবে উপদেশ দেওয়া বিধেয়। যদি তিনি বন্ধুত্ব-গুণের প্রকৃত মর্য্যাদা গ্রহণ করিতে ও আমাদের উপদেশ-বাক্যের অভিসন্ধি বুঝিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে, তিনি আপনার অবলম্বিত অধর্ম্ম-পথ পরিত্যাগ করিতে সচেষ্ট হইবেন ও আমাদের প্রতি রুষ্ট না হইয়া, সমধিক সন্তুষ্টই হইবেন। আমরা তাঁহার ধর্ম্ম-রূপ অমূল্য রত্ন উদ্ধারার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া, তিনি আমাদের প্রতি অধিকতর অনুরাগ প্রকাশ করিবেন, এবং প্রণয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা-রস মিলিত করিয়া, অপূর্ব্ব মাধুর্য্য-ভাব প্রদর্শন করিবেন।

যাঁহারা সরলান্তঃকরণে প্রিয়-বচনে মিত্র-গণের দোষোল্লেখ করিয়া, সদুপদেশ প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহারা প্রকৃত মিত্র-পদের বাচ্য নহেন। যাঁহারা কোন মিত্রের কুপ্রবৃত্তি সমুদায় বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া, তাঁহার রোষোৎপত্তির আশঙ্কায় বাক্যমাত্র ব্যয় করেন না, স্পষ্টবাদী শত্রু-সকল তাঁহাদের অপেক্ষা হিতকারী সুহৃদ্ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। রোমক-রাজ্যের এক পণ্ডিত কহিয়া গিয়াছেন, "অনেক ব্যক্তি প্রিয়ংবদ মিত্র অপেক্ষায় বদ্ধবৈর শত্রু-সমীপে অধিক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কারণ, তাঁহারা উক্তরূপ শত্রুর নিকট সকল যথার্থ কথা শ্রবণ করিয়াছেন, কিন্তু উক্তরূপ মিত্রগণের নিকট কস্মিন্‌কালে শুনেন নাই। তাঁহাদের বিরাগ ও অনুরাগ উভয়ই বিপরীত ; কেন না, তাঁহারা অধর্ম্মের অনুরক্তি ও সদুপদেশ-গ্রহণে বিরক্তি প্রকাশ করেন। ধনাঢ্যদিগের মধ্যে অনেকেই, অথবা প্রায় সকলেই উক্তরূপ মিত্র-মণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত থাকেন। তাঁহারা আপনার তুষ্টিকর ভিন্ন অন্য বাক্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন না এবং তাঁহারা যে সমস্ত পদানত বন্ধুকে বন্ধু সম্বোধন করেন, তাহারাও তাঁহাদের তোষ-জনক ব্যতীত অন্য বাক্য উল্লেখ করিতে সাহসী হয় না। ধনী মহাশয়েরা চতুর্দ্দিক্ হইতে আপন ধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনিতেই ভালবাসেন এবং তদীয় আজ্ঞাবহ মিত্র মহাশয়েরা প্রতি বাক্যেতেই তাঁহাদের সে বাসনা সুসিদ্ধ করিতে থাকেন। পূজ্য ও পূজক উভয় বন্ধুর মধ্যে এক জন পরিচারণা ও অন্য জন অর্থলাভমাত্র অভিলাষ করেন। তাঁহারা যদি পরস্পর মিত্রশব্দের বাচ্য হইতে পারেন, তবে ক্রীত দাস ও ক্রেতা স্বামীই বা সেই শব্দের প্রতিপাদ্য কেন না হইবে ? অকপট-হৃদয়ে অকুণ্ঠিত-ভাবে সদুপদেশ প্রদান করা এবং সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ-পূর্ব্বক সেই উপদেশ গ্রহণ করা, বন্ধুত্ব-গুণের প্রকৃত লক্ষণ। সে স্থলে যদি চাটুকারিতা-দোষ উপস্থিত হয়, তবে সে চাটুকারিতা যেমন অনিষ্টকর হইয়া উঠে, বিদ্বেষীদিগের সুস্পষ্ট বিদ্বেষ-বচন কদাচ সেরূপ অনিষ্টকর নয়।

তৃতীয়তঃ। কাহারও সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে বদ্ধ হইতে হইলে, সে সময়ে কিরূপ আচরণ করিতে হয় এবং বদ্ধ হইবার পরেই বা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, এই দুই বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লিখিত হইল। এক্ষণে বন্ধুত্ব-ঘটিত চরম ক্রিয়ার বিষয় অতি সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

সৎপাত্রে প্রণয় সংস্থাপন করিলে, কস্মিন্ কালে সে প্রণয়ের বিচ্ছেদ হওয়া সম্ভব নয়। যাঁহারা পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট পবিত্র নিয়মানুসারে পরস্পর বন্ধুত্ব-ব্রত অবলম্বন করেন, তাঁহাদের মধ্যে এক জনের অন্তিম দশা উপস্থিত না হইলে, তদীয় বন্ধুত্বেরও অন্তিম দশা উপস্থিত হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, মিত্র-পরিগ্রহ-সময়ে যিনি যত বিবেচনা করুন না কেন ও যত সাবধান হউন্ না কেন, লক্ষণাক্রান্ত সুজন মিত্র নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া সুকঠিন কর্ম্ম। অবনী-মণ্ডলে জ্ঞান-পবিত্র সুচরিত্র মিত্র-সদৃশ সুদুর্লভ পদার্থ আর কিছুই নাই। আমরা এক সময়ে যাঁহাকে নিতান্ত নিষ্কলঙ্ক জানিয়া, সুহৃদ্ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, অন্য সময়ে তাঁহার এমন কলঙ্ক প্রকাশিত হইয়া পড়ে যে, তাঁহার সহিত সৌহৃদ্য রাখিবার আর পথ থাকে না। যদিও তিনি কোন গুরুতর দুষ্টদোষে দূষিত না হন, তথাচ এরূপ সন্দিগ্ধ, সারল্য-হীন ও কোপন-স্বভাব হইতে পারেন যে, তাঁহার প্রণয়-পাত্র ও বিশ্বাস-ভাজন হওয়া একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠে। অতএব যাঁহারা পরস্পরের গুণাগুণ বুঝিতে অসমর্থ হইয়া বন্ধুত্ব-বন্ধনে বদ্ধ হন, কোন না কোন কালে তাঁহাদের সেই বন্ধন একেবারে ছিন্ন হওয়া সম্ভব। যদি ভাগ্য-দোষ-বশতঃ এতাদৃশ নিদারুণ ঘটনা নিতান্তই ঘটিয়া উঠে, তথাচ তাঁহাদিগের বন্ধুত্ব-ঘটিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনের সমাপ্তি হয় না। আমরা জন্মাবধি কস্মিন্ কালে যাহার মুখাবলোকন করি নাই, আর যাহার সহিত সহবাস ও সদালাপ করিয়া, পুলকিত-চিত্তে কিয়ৎকাল অতিপাত করিয়াছি, এই উভয়ই আমাদের সমান যত্নের পাত্র বা সমান অবজ্ঞার বিষয় বলিয়া কখনই গণ্য হইতে পারে না। যদিও ঐ শেষোক্ত সুহৃদ্ মহাশয় আমাদের সহিত নিতান্ত ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়া, আমাদের অনুরাগ লাভের একান্তই অযোগ্য হন,

তথাচ তিনি সদ্ভাবের সময়ে বিশ্বাস করিয়া আমাদিগকে যে কোন গোপনীয় বিষয় অবগত করিয়াছিলেন, সেই সদ্ভাবের অসদ্ভাব হইলেও, তাহা কদাচ ব্যক্ত করা উচিত নয়। যে সময়ে কাহারও সহিত সৌহৃদ্য থাকে, সে সময়ে তিনি আপনার মনের কবাট উদ্ঘাটন করিয়া, আমাদের নিকট এতাদৃশ গুহ্য বিষয় প্রকাশ করিতে পারেন যে, তাহা ব্যক্ত হইলে, তাঁহার অশেষ অনর্থের উৎপত্তি হইতে পারে। যদি তাঁহার উক্ত-রূপ অনর্থের অথবা কিছুমাত্র অনিষ্ট-ঘটনার সম্ভাবনা নাও থাকে, তথাচ যখন আমরা তাঁহার নিকট স্বীকার করিয়াছি—অমুক বিষয় অপ্রকাশ রাখিব, তখন তাহা প্রাণ-সত্বে প্রকাশ করা বিধেয় নয়। যদি তাঁহার সমীপে উক্তরূপ বাচনিক অঙ্গীকার নাই করিয়া থাকি, তথাচ যাঁহার সহিত প্রণয়-পাশে বদ্ধ থাকিতে হয়, তাঁহার নিকট উক্তরূপ অঙ্গীকার করা, প্রথমাবধিই সিদ্ধ হইয়া থাকে। বন্ধুজনের গুহ্য বিষয় ব্যক্ত করা বিহিত নয়, ইহা বন্ধুত্ব-বিষয়ক এক প্রধান নিয়ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব তিনি সদ্ভাব সত্বে বিশ্বাস করিয়া, সংগোপনে যে বিষয় আমাদিগকে অবগত করিয়াছেন, সদ্ভাবের অসদ্ভাব হইলেও, তাহা চিরকালই হৃদয়-মধ্যে যত্নপূর্ব্বক নিহিত রাখা বিধেয়।

প্রায় সকল বিধিরই স্থল-বিশেষে সঙ্কোচ করিতে হয়। সৌহৃদ্যের বিভেদ হইলেও, সুহৃজ্জনের গুহ্য বিষয় প্রকাশ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু একটি স্থলে উহা নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। যদি তিনি দ্বেষ-পরবশ হইয়া, মিথ্যাপবাদ দিয়া, আমাদের নির্দ্দোষ চরিত্রকে দূষিত বলিয়া প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন, আর তাঁহার পূর্ব্ব-কথিত কোন গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত না করিলে, সে দোষে উদ্ধার পাইবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে, সে বিষয়

প্রকাশ করা কদাচ অবৈধ বলিয়া অঙ্গীকার করা যায় না। তিনি যখন অনর্থক অপবাদ দিয়া, আমাদের অকলঙ্কিত চরিত্রকে কলঙ্কিতবৎ প্রতীয়মান করিতে উদ্যত হইলেন, তখন বলিতে হইবে, আমরা যে তাঁহার পূর্ব্ব-কথিত গুপ্ত বিষয় গোপন রাখিব, তিনি আর এরূপ প্রত্যাশা করেন না।

এতাদৃশ সুহৃদ্ভেদ সমধিক যন্ত্রণার বিষয়। কিন্তু অনেকের বন্ধুত্ব ইহা অপেক্ষাও স্থায়ী ও সুখকর হইয়া থাকে। জীবনান্ত-ব্যতিরেকে তাঁহাদের সৌহৃদ্য-ভাবের অন্ত হয় না। সুহৃদ্ভাগ্যশালী উভয় মিত্রের মধ্যে একজন যদি দুর্ব্বিপাকবশতঃ প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে, অন্য জন তখনও একেবারে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না, এবং নিষ্কৃতি পাইতে বাসনাও করেন না। তিনি মিত্রের শোকে বিমুগ্ধ হইয়া অশ্রু-জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিলেও, সে জলে তাঁহার হৃদয়-স্থিত প্রীতির চিহ্ন প্রক্ষালিত হয় না। তিনি বন্ধুর দেহ দীপ্ত চিতায় দগ্ধ হইতে দেখিলেও, সে বন্ধুর কথনোন্মুখ মনোহর মূর্ত্তি তাঁহার চিত্ত-পথ হইতে অপনীত হয় না। তিনি অতি দুঃসহ শোক-সন্তাপে সন্তপ্ত হইলেও, তাঁহার অন্তঃকরণের প্রেমের অঙ্কুর কদাচ দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয় না। বন্ধুর মান, বন্ধুর যশ ও বন্ধুর পরিজন, তখন তাঁহার প্রীতি ও স্নেহ অধিকার করিয়া থাকে। তিনি মৃত বন্ধুর পরিবার ও দেশান্তর-নিবাসী অজ্ঞাত-কুল-শীল ব্যক্তির পরিবার, এই উভয়ের প্রতি কদাচ সমান ভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। তিনি অপরিচিত ব্যক্তির দুরবস্থার বিষয় শুনিয়া যেমন উদাসীন থাকেন, মৃত বন্ধুর সন্তানের বিপৎ-পতনের সমাচার শুনিয়া, সেরূপ উদাসীন থাকিতে কদাচ সমর্থ হন না। মৃত বন্ধুকে স্মরণ রাখা, তাঁহার সদ্গুণ-সমূহ কীর্ত্তন করিয়া তদীয় যশঃ-শশধর বিমল রাখিতে চেষ্টা পাওয়া এবং তাঁহার

পরিজন-বর্গের প্রতি অনুরক্ত থাকিয়া, তাহাদের প্রতি সৌজন্য ও কারুণ্যভাব প্রকাশ করা, সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

মেঘ ও বৃষ্টি।

জল উত্তপ্ত হইলে যে ধূমাকার পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বাষ্প কহে। শীত ঋতুর প্রাতঃকালে নদী, সরোবর প্রভৃতি হইতে যে ধূমাকার বস্তু উঠিতে দেখা যায়, তাহাও ঐ বাষ্প বৈ আর কিছুই নয়। ঐ সকল বাষ্প ঘন হইলেই মেঘ হয়। মেঘ সচরাচর দুই ক্রোশের অধিক উঠিতে পারে না। এমন কি, অনেক মেঘ ১৷৷০ দেড় ক্রোশ পর্য্যন্তও উত্থিত হয় না। বৃষ্টির সময়ে কতখান মেঘ কেবল অর্দ্ধক্রোশমাত্র ঊর্দ্ধে থাকিয়া জল বর্ষণ করে, এই নিমিত্ত উচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ করিলে, অধোদিকে মেঘের চলাচল দেখিতে পাওয়া যায়। ৪।৫ চারি পাঁচ ক্রোশ উপরের বায়ু অতি স্বচ্ছ ও পরিশুষ্ক। তথায় মেঘ ও বাষ্পের লেশ মাত্র নাই।

মেঘের উৎপত্তি, বায়ুর শৈত্য ও উষ্ণত্বের উপর বিস্তর নির্ভর করে। জল যত উত্তপ্ত হয়, তাহা হইতে ততই বাষ্প উঠিতে থাকে। এ নিমিত্ত প্রখর গ্রীষ্মের সময়ে অধিক বাষ্প উৎপন্ন হইয়া অধিক দূর উত্থিত হয়। সেই সমস্ত বাষ্প উপরিস্থিত বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া থাকে; অত্যন্ত লঘু বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ সমূহ বাষ্প-রাশি আকাশ-মণ্ডলে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, এমত সময়ে যদি কোন দিক্ হইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইয়া, তাহার সহিত মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে, ঐ সকল বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘ জন্মায়। এইরূপ অন্য অন্য কারণেও বায়ুর উষ্ণতা-হ্রাস ও শৈত্য-বৃদ্ধি হইয়া, মেঘ উৎপাদন

করে। দিবাবসান-কালে বায়ুর উত্তাপ ক্রমশঃ অল্প হইতে থাকে; এই নিমিত্ত সে সময়ে সতত মেঘ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। উপরি-স্থিত বায়ু অধঃস্থিত বায়ু অপেক্ষা শীতল; এই হেতু যে সমস্ত জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হইবার সময়ে অদৃশ্য থাকে, তাহা উপরে উঠিয়া ঘন হইয়া মেঘ জন্মায়।

উপরে প্রতিক্ষণ নানা দিকে নানাপ্রকার বায়ু-প্রবাহ বহিতে থাকে এবং সেই সঙ্গে মেঘ-সমুদায় ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া অশেষবিধ অদ্ভুত আকার ধারণ করে। মেঘ সকল এক নিমিষের নিমিত্তেও স্থির নহে, সর্ব্বদাই তাহাদের কোন না কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়। অদৃশ্য জলীয় বাষ্পের সহিত শীতল বায়ু মিশ্রিত হইলে, যেমন সেই বাষ্প ঘন হইয়া, মেঘ উৎপাদন করে, সেইরূপ আবার উৎ-পাদিত মেঘে উষ্ণ বায়ু লাগিলে, সেই মেঘ বিক্ষিপ্ত হইয়া, অদৃশ্য হইয়া যায়। এক এক খান মেঘ উঠিতে উঠিতে যে অন্তর্হিত হইতে দেখা যায়, তাহার কারণ এই।

সমুদায় মেঘই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জল-কণা-সমূহ ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। তাহাতে সূর্য্যের কিরণ পতিত হইয়া, অশেষ-প্রকার মনোহর বর্ণ উৎপাদন করে। সূর্য্য-কিরণে নীল, পীত, লোহিত, হরিৎ, পাটল প্রভৃতি নানা বর্ণ আছে। বহু-কোণ-বিশিষ্ট কাচে ও অন্য অন্য কোন বস্তুতে সূর্য্য-কিরণ পাতিত করিয়া, ঐ সকল বর্ণ পৃথক্ করিয়া দেখান যায়। বেলোয়ারি ঝাড়ের কলমে রৌদ্রের আভা পতিত হইয়া যে নানাবিধ বর্ণ উৎপাদন করে, তাহা অপর সাধারণ সকলেই বিদিত আছে। গগন-মণ্ডলস্থ মেঘাবলির বিচিত্র বর্ণও এইরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে; সচরাচর এই কয়েক বর্ণের মেঘ দেখিতে পাওয়া যায়;—শ্বেত, পীত, লোহিত, পিঙ্গল ও ধূসর। হরিদ্বর্ণ

মেঘও পরম সুদৃশ্য; কিন্তু অতি বিরল। সায়ংকালীন জলদ-জালের মনোহর শোভা সন্দর্শন করিয়া, কে না মোহিত হয়?

রামধনুর পরম সুন্দর শোভাও ঐরূপে সমুদ্ভূত হয়। উল্লিখিত বহুকোণ কাচের ন্যায়, বৃষ্টি-কালীন জল-কণা-সমূহে সূর্য্য-রশ্মি পতিত হইলেও, তাহার অন্তর্বর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন কিরণ-জাল সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। উহার এক একটি জল-কণা এক এক খানি বহুকোণ কাচ-স্বরূপ। এইরূপ বহু-সংখ্যক জল-বিন্দু একত্র হইয়া রামধনু উৎপাদন করে। নভো-মণ্ডলের যে ভাগে সূর্য্য-মণ্ডল অবস্থিত থাকে, তাহার বিপরীত ভাগে রামধনু দৃষ্ট হয়। লোকে উহাকে রামধনু ও ইন্দ্র-ধনু উভয়ই বলিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক উহা কাহারও ধনু নয়। জল-কণা-সমূহে সূর্য্য-কিরণ পতিত হইয়া, এইরূপ মনোহর আকার উৎপন্ন হয়। সূর্য্য-কিরণের ন্যায় চন্দ্র-কিরণেও রামধনু উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু চান্দ্র রামধনুর বর্ণ সৌর রামধনুর তুল্যরূপ উজ্জ্বল নয়। যিনি এই অত্যাশ্চর্য্য অচিন্ত্য বিশ্ব-কার্য্যের সর্ব্ব স্থানে সুললিত-সৌন্দর্য্য-সুধা বর্ষণ করিতেছেন, উহাতে কেবল তাঁহারই অনির্ব্বচনীয় মহিমা প্রকাশ পাইতেছে!

মেঘ কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল-কণা-ব্যতিরেকে যে আর কিছুই নয়, ইহা পূর্ব্বে একবার উল্লিখিত হইয়াছে। যেমন বাষ্প শীতল হইয়া মেঘ জন্মায়, সেইরূপ মেঘ শীতল হইলে, তাহার অণু-সমুদায় ঘন হইয়া, জল হইয়া পড়ে। যে মেঘের ভার যে স্থানের বায়ুর ভারের সমান, সেই মেঘ সেই স্থানে অবস্থিত থাকে। পরে কোন হেতু-বশতঃ শীতল হইলেই, ঘনীভূত ও ভারাক্রান্ত হইয়া জলধারা-রূপে পৃথিবীতে পতিত হয়। ইহাকেই বৃষ্টি কহে। অতএব বৃষ্টির নিয়ম অতি সহজ। ইহা জানিবার নিমিত্ত অধিক আয়াস আবশ্যক করে না।

সমুদ্র ও জলাভূমি হইতে অধিক বাষ্প উত্থিত হয়। এই নিমিত্ত সেই সেই স্থানে ও তাহার সমীপবর্ত্তী প্রদেশে অধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে। পর্ব্বত-শিখর অপেক্ষাকৃত শীতল; অতএব যে সকল মেঘ চলিতে চলিতে, পর্ব্বত-শিখরে গিয়া অবস্থিত হয়, তাহা শীতে ঘনীভূত হইয়া জল হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত পর্ব্বতেও অধিক পরিমাণে জল-বর্ষণ হইয়া থাকে। যে পর্ব্বত সমুদ্রের সমীপবর্ত্তী, তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বর্ষণ হয় এবং যে পর্ব্বত সমুদ্র-তট হইতে দুরবর্ত্তী, তাহাতে তদপেক্ষা অল্পতর বৃষ্টিপাত হয়।

বায়ু-প্রবাহের ইতর-বিশেষ দ্বারা বৃষ্টি-পাতেরও অনেক ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকে সমুদ্র; এ নিমিত্ত বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ প্রভৃতি যে কয়েক মাস দক্ষিণ দিক্ অথবা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে বায়ু বহিতে থাকে, সেই সেই মাসে উল্লিখিত সমুদ্র হইতে উৎপন্ন মেঘ-সমুদায় ঐ বায়ু-সহকারে সঞ্চালিত হইয়া, ভারত-ভূমির উপর প্রচুর বারিবর্ষণ করে। এই প্রবল বায়ু কয়েক মাস প্রবাহিত থাকাতে ভারতবর্ষের বর্ষাকাল, শীত বসন্ত গ্রীষ্মাদি ঋতুর ন্যায়, এক স্বতন্ত্র ঋতু বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে। ইংলণ্ডে ও তাদৃশ অন্য অন্য প্রদেশে এরূপ স্বতন্ত্র বর্ষা ঋতু নির্দ্দিষ্ট নাই, সে সকল স্থানে বার মাসই বৃষ্টি হয়। ভারত-বর্ষের উত্তর দিকে মেঘোৎপত্তির উপায় নাই। এ নিমিত্ত, এত-দ্দেশে কার্ত্তিক মাসে দক্ষিণ-বায়ু নিবৃত্ত হইয়া, উত্তরীয় বায়ু আরব্ধ হইলে, জল-বর্ষণও এক প্রকার নিবৃত্ত হয়।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডের অর্থাৎ দক্ষিণাপথের পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ তিন দিকেই সমুদ্র। এ নিমিত্ত, যে সময়ে পশ্চিম-দক্ষিণ কোণ হইতে বায়ু বহিতে থাকে, তখন দক্ষিণাপথের পশ্চিম-দক্ষিণ

প্রান্তে, অর্থাৎ মলয়বর-দেশে প্রচুর বারিবর্ষণ হয়, এবং যখন পূর্ব্বোত্তর হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়, তখন পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তে অর্থাৎ চোর-মণ্ডল-নামক উপকূলে আসিয়া মেঘ ও বৃষ্টি উপস্থিত করে।

পর্ব্বতাদি দ্বারা বায়ুর প্রবাহ প্রতিরুদ্ধ ও পরিবর্দ্ধিত হওয়াতেও বৃষ্টি-পাতের অনেক ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে। যে বায়ু-প্রবাহ দ্বারা বাষ্পবারি আনীত হইয়া, ভারতবর্ষের পূর্ব্বোত্তর খণ্ডে মেঘ সঞ্চারিত ও বারি বর্ষিত হয়, তাহা প্রথমতঃ পশ্চিম-দক্ষিণ হইতে বঙ্গীয় অখাতের উপর দিয়া বাহিত হয়। পরে, যখন হিমালয় ও তৎসন্নিহিত দক্ষিণ-দিক্স্থ পর্ব্বতের নিকট উপনীত হইয়া, তদ্দ্বারা প্রতিহত হয়, তখন আর উত্তরাংশে গমন করিতে না পারিয়া, পশ্চিমোত্তর ভাগে চলিতে থাকে। পশ্চিমোত্তর ভাগে বহিতে বহিতে, যখন হিন্দুকুশ নামক পর্ব্বতে গিয়া উপস্থিত হয়, তখন তদ্দ্বারা প্রতিবদ্ধ হইয়া, পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইতে থাকে। এই প্রকারে স্থলিমান-নামক পর্ব্বত পর্য্যন্ত গমন করিয়া, তদ্দ্বারা পুনরায় প্রবাহিত হইয়া, অন্য দিকে সঞ্চরণ করে।

যে সমস্ত মেঘ ও বায়ু উল্লিখিত বায়ু-প্রবাহ দ্বারা সঞ্চারিত হয়, তাহা হিমালয়ের উত্তরাংশে গমন করিতে পারে না; হিমালয়-কর্ত্তৃক প্রতিরুদ্ধ হইয়া, বারিবর্ষণ-পূর্ব্বক গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী প্রভৃতি অনেক অনেক নদীর জল বৃদ্ধি করে ও সেই সমস্ত নদীর তীরস্থ ভূমি জলে প্লাবিত করিয়া, উর্ব্বরা করিয়া থাকে। ঐ বায়ু হিমালয় উল্লঙ্ঘন করিয়া, তাহার উত্তর দিকে মেঘ ও বাষ্প সঞ্চালন করিতে পারে না। এ নিমিত্ত, জলাভাবে সেই প্রদেশ মরুভূমি হইয়া রহিয়াছে।

যদি কোন পর্ব্বতময় প্রদেশ হইতে বায়ু বহিতে থাকে, তাহা হইলে, তত্রস্থ মেঘ-সমুদায় সেই বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া, অন্য অন্য নিম্নস্থানে গিয়া বর্ষণ করে। যদি সেই সমস্ত স্থান অপেক্ষাকৃত উষ্ণ হয়, তাহা

হইলে, ঐ মেঘ ঘনীভূত না হইয়া, আরও লঘু হইয়া যায়; সুতরাং তাহাতে বৃষ্টি হয় না। এই কারণে ইউরোপের দক্ষিণ-পার্শ্ববর্ত্তী ভূমধ্য-সাগর হইতে যে সমস্ত বাষ্পরাশি উৎপন্ন হইয়া মিশর দেশের উপর দিয়া, দক্ষিণাভিমুখে গমন করে, তাহা উল্লিখিত মিশর দেশের উপরে ঘনীভূত ও বর্ষিত না হইয়া, উত্তরোত্তর দক্ষিণ দিকেই চলিয়া যায়। পরে যখন আবিসিনিয়ার পর্ব্বতময় উন্নত প্রদেশে গিয়া উপস্থিত হয়, তখন জল হইয়া বর্ষিত হইতে থাকে। এই নিমিত্ত মিশর দেশে সর্ব্বদাই অনাবৃষ্টি, গ্রীষ্মকালে মূলেই বৃষ্টি হয় না, অন্য সময়েও অতি অল্প। বিশেষতঃ তাহার দক্ষিণখণ্ডে জল-বর্ষণ অতি অসামান্য ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত আছে। তত্রত্য লোক বৃষ্টি ব্যতিরেকে কিরূপে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে, বিবেচনা করিতে হইলে, আপাততঃ বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কিন্তু করুণাময় পরমেশ্বর অনির্ব্বচনীয় কৌশল প্রকাশ করিয়া, তাহাদের অনাবৃষ্টি-ঘটিত অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা একেবারে নিবারণ করিয়া রাখিয়াছেন; তথায় যেমন যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয় না, তেমন গ্রীষ্মকালে এরূপ শিশির-বর্ষণ হয়, যে, তথাকার মৃত্তিকা তাহাতেই আর্দ্র হইয়া, বিলক্ষণ উর্ব্বরা হইয়া উঠে। তদ্ভিন্ন, তথায় নীল-নামে এক নদী আছে; তাহা গঙ্গা নদীর ন্যায় প্রতিবর্ষে বৃদ্ধি পাইয়া, উভয় তট কয়েক মাস জলে প্লাবিত করিয়া রাখে। উহাতে ঐ উভয় তীরস্থ ভূমি অত্যন্ত-রসশালিনী হইয়া অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপাদন করে।

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তঃপাতী পেরু দেশে বালেশ-নামে এক স্থান আছে, তথায় দক্ষিণ দিক্ হইতে উত্তর দিকে বায়ু বহিয়া থাকে। সে স্থানের দক্ষিণ দিক্ শীতল এবং উত্তর দিক্ অপেক্ষাকৃত উষ্ণ। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, শীতল প্রদেশ হইতে উষ্ণ

প্রদেশে বাষ্প সঞ্চালিত হইলে বৃষ্টিপাত হয় না। এই নিমিত্ত ঐ বালেশ ভূমিতে কোন কালেই বৃষ্টি হয় না। কিন্তু করুণার্ণব বিশ্ব-বিধাতার কি আশ্চর্য্য মহিমা! সেখানে যেমন কোন সময়ে বিন্দু-পাতও হয় না, তেমন শীতকালে এরূপ ঘোরতর কুজ্ঝটিকা উৎপন্ন হইয়া থাকে যে, তদ্দ্বারা অত্যন্ত অনুর্ব্বরা ভূমিও উর্ব্বরা হয় এবং পথের ধূলিও কর্দ্দম হইয়া যায়।

আমাদের দেশে যেমন দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকের বায়ুতে অধিক বৃষ্টি হয়, অন্য অন্য দেশেও ইহার অনুরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। দেশ-বিশেষে দিগ্‌বিশেষ হইতে বায়ু বহিলে যে বর্ষণের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে, ইহা তত্তদ্দেশীয় লোকের নিকট প্রসিদ্ধ আছে। ইংলণ্ড দেশে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে বায়ু বহিলে অধিক বৃষ্টি হয়। ইহার কারণ এই যে, ঐ দেশের দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অতি বিস্তৃত সমুদ্র আছে, সেই সমুদ্রের কিয়দংশ অতিশয় উষ্ণ; সুতরাং তথা হইতে প্রচুর বাষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিশেষতঃ পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন, উষ্ণ বায়ুর সহিত অপেক্ষাকৃত অধিক বাষ্প মিশ্রিত থাকিতে পারে। ইংলণ্ডের দক্ষিণ দিক্ হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, ঐ বাষ্প সেই বায়ু-সহকারে সঞ্চালিত হইয়া, ইংলণ্ড স্কটলণ্ড প্রভৃতি শীতল প্রদেশে নীত হইলে, ঘনীভূত হইয়া বৃষ্টি হইয়া পড়ে।

কোন্ প্রদেশে কত বৃষ্টি পতিত হয়, পণ্ডিতেরা তাহা পরিমাণ করিয়া দেখিবার নিমিত্ত বর্ষ-মান নামে এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রতিবর্ষে কোন্ স্থানে কত জল পতিত হয়, ঐ যন্ত্র দ্বারা পরিমাণ করিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়। উহাতে যত বুরুল জল পতিত হয়, তত্তৎ স্থানে বৃষ্টি তত বুরুল বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। বর্ষ-

মান দ্বারা পরিমাণ করিয়া বোম্বাই, কলিকাতা, রোম, লণ্ডন, উলিয়াবর্গ এই কয়েক স্থানে বৃষ্টির পরিমাণ যেরূপ নিরূপিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

এক বৎসরের বৃষ্টির পরিমাণ।

বোম্বাই	৮২	বুরুল।
কলিকাতা	৮১	"
রোম	৩৯	"
লণ্ডন	২২১৮	"
উলিয়াবর্গ	১৩॥০	"

এই কয়েক স্থানের মধ্যে বোম্বাই সর্ব্বাপেক্ষা উষ্ণ এবং উলিয়া বর্গ সর্ব্বাপেক্ষা শীতল। উষ্ণ স্থানে অধিক বৃষ্টি পতিত হয়, শীতল স্থানে তদপেক্ষা অল্প। ইহার কারণ, উষ্ণ স্থানে যত বাষ্প উৎপন্ন হয়, শীতল স্থানে কখনই তত হয় না। বাষ্প অধিক উৎপন্ন না হইলে, সুতরাং বৃষ্টিও অধিক হইতে পারে না। ফলতঃ পৃথিবীর যে সকল প্রদেশ প্রখর রবি-কিরণে প্রতপ্ত, তথায় অধিক বারিবর্ষণ আবশ্যক করে, এই নিমিত্তই পরম-কারুণিক পরমেশ্বর জল-বর্ষণ-বিষয়ে ঐরূপ শুভকর ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন।

জল-বর্ষণের সহিত কখন কখন অন্য অন্য বস্তুও পতিত হইতে দেখা গিয়াছে। এ বিষয় আপাততঃ আশ্চর্য্য বোধ হয় বটে, কিন্তু পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা তাহার হেতু নির্দ্দেশ করিয়া সে আশ্চর্য্য দূরীকৃত করিয়াছেন। ১৮১০ আঠার শত দশ খৃষ্টাব্দে ইয়ুরোপের

অন্তঃপাতী হঙ্গেরী দেশে রক্তের ন্যায় লোহিতবর্ণ জল বর্ষিত হয়। প্রথমে ইহা অতিশয় বিস্ময়কর বোধ হইয়াছিল, পরে অবধারিত হইল, ঐ প্রদেশের অনতিদূরে এক অরণ্য আছে; তাহা হইতে পুষ্প-রেণু সকল বায়ু-সহকারে সঞ্চালিত হইয়া, বৃষ্টির সহিত পতিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় লোক যে রক্ত-বৃষ্টির কথা কহিয়া থাকে, তাহাও এইরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। এক বার আয়র্লণ্ডে বৃক্ষ-নির্যাসের ন্যায় ঘনতর একপ্রকার দ্রব পদার্থ পতিত হয়। পরীক্ষা করিয়া নিরূপিত হইল, তাহাও উদ্ভিদ্ ও জন্তু-বিশেষ হইতে নির্গত পদার্থ-বিশেষ ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। একদা পারস্তানে এমন একরূপ অপরিজ্ঞাত পদার্থ পতিত হয় যে, পশুগণ তাহা ভক্ষণ করিয়া পরিপাক করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১৮২৮ আঠার শত আটাইশ খৃষ্টাব্দে ঐ বস্তু ফরাশিশ দেশের এক সমাজে উপস্থিত করা হয়। উহা এক প্রকার উদ্ভিদ্। চীন দেশে প্রতি বৎসর বারংবার বালুকা-বর্ষণ হইয়া থাকে। ১৭৭৪ সতর শত চুয়াত্তর শকের চৌদ্দই চৈত্রে আরম্ভ হইয়া ১৭ সতরই চৈত্র পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত এরূপ বালুকাবৃষ্টি হয় যে, ঐ কয়েক দিবস চন্দ্র-সূর্য্য অদৃশ্যবৎ হইয়াছিল। চীন দেশের উত্তর পার্শ্বে গবি নামে বহু-বিস্তৃত বালুকা-ভূমি আছে এবং তথায় সর্ব্বদা ঘোরতর ঘূর্ণি-বায়ুও উপস্থিত হইতে থাকে; অতএব বোধ হয়, ঐ বালুকা ঘূর্ণি-বায়ু দ্বারা আকাশমণ্ডলে উৎক্ষিপ্ত হইয়া, অনেক অনেক দূরবর্ত্তী প্রদেশে বর্ষিত হইয়া থাকে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বায়ুই এই সমুদায় অদ্ভুত বৃষ্টিপাতের প্রবল কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কত কত মৎস্য প্রবল বায়ু দ্বারা ৪।৫ চারি পাঁচ ক্রোশ পরিচালিত হইয়া থাকে।

তাড়িত, বিদুৎ ও বজ্রাঘাত।

ভূ-মণ্ডল ও তাহার উপরিস্থিত বায়ু-মণ্ডলের সর্ব্বস্থানে এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম পদার্থ আছে, তাহার নাম তাড়িত।

এই পরমাশ্চর্য্য পদার্থ সচরাচর প্রত্যক্ষ হয় না; কিন্তু কখন কখন কোন কোন বস্তু হইতে অতি সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ-স্বরূপে আবির্ভূত হয়। বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি এই পদার্থের কার্য্য। আর কাচ, রেশম, তৈলস্ফটিক, গন্ধক, ধূনা প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য ঘর্ষণ করিয়া, তাহা হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প-প্রমাণ তাড়িত প্রকাশ করিতে পারা যায়।

যদি কাচ অথবা লাক্ষা শুষ্ক হস্তে অথবা লোমজ বস্ত্রে ঘর্ষণ করিয়া কেশ, সূত্র, পালক, মৃগজ অথবা অন্য কোন লঘু দ্রব্যের নিকট ধরা যায়, তবে ঐ লঘু দ্রব্য সেই কাচ অথবা লাক্ষা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, তাহাতে লগ্ন হইয়া থাকে। কিন্তু অত্যল্প কাল সংযুক্ত থাকিয়াই বিযুক্ত হইয়া পড়ে। এই উভয় ব্যাপারই ঐ তাড়িত নামক পদার্থের গুণ। যে গুণ দ্বারা লঘু বস্তু কাচ অথবা লাক্ষার সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে, তাহাকে তাড়িতাকর্ষণ বলে এবং যে গুণ দ্বারা তাহা হইতে বিযুক্ত হয়, তাহাকে তাড়িত-বিয়োজন কহে।

তাড়িতের আর এক গুণ এই যে, যদি উহা এক স্থানে অধিক থাকে এবং তাহার নিকটবর্ত্তী অন্য স্থানে অল্প থাকে, তবে প্রথমোক্ত স্থানের কিয়দংশ, শেষোক্ত স্থানে আসিয়া উভয় স্থানের সমান হয়। যদি একখানা মেঘে অধিক-প্রমাণ তাড়িত থাকে, আর একখানা মেঘে অল্প-প্রমাণ থাকে, তবে উভয় মেঘ পরস্পর নিকটবর্ত্তী

হইবার সময়ে, প্রথমোক্ত মেঘের কিয়ৎ-পরিমাণ তাড়িত নির্গত হইয়া, শেষোক্ত মেঘে প্রবিষ্ট হয়। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটনার সময়ে অতি প্রখর জ্যোতিঃপ্রকাশ ও ঘোরতর মেঘ-গর্জ্জন হয়, লোকে তাহাকেই বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি কহিয়া থাকে। পৃথিবী হইতে মেঘে, অথবা মেঘ হইতে পৃথিবীতে তাড়িত পদার্থ প্রবেশ করিবার সময়েও ঐরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। বজ্রাঘাত ঐ তাড়িত-প্রবাহের আঘাত ব্যতিরেকে আর কিছু নয়।

কোন কোন বস্তু ঐ তাড়িত পদার্থকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সত্বর সঞ্চালন করিয়া থাকে। সেই সকল বস্তুকে তাড়িত-পরিচালক কহে। অন্য কতকগুলি বস্তুর পরিচালকতা-শক্তি এত অল্প যে, কোন স্থানে তাড়িতের সঞ্চারণ নিবারণ করিতে হইলে, ঐ সকল দ্রব্য ব্যবধান দিতে হয়। ঐ সমস্ত বস্তুকে অপরিচালক কহে।

সমুদায় ধাতুই প্রবল পরিচালক। তদ্ভিন্ন অঙ্গার, লবণাক্ত জল প্রভৃতি আর কতকগুলি দ্রব্য আছে, তাহারাও পরিচালক বটে, কিন্তু ধাতুর সদৃশ নহে। কাচ, পালক, পশুলোম এ সমুদায় সর্ব্বতোভাবে অপরিচালক।

অনেকে দেখিয়া থাকিবেন, কেহ কেহ অট্টালিকার পার্শ্বে এক একটা লৌহময় শীক স্থাপন করিয়া থাকেন। ঐ শীক অট্টালিকার অপেক্ষা উচ্চ। যে যে ধাতুতে উহা প্রস্তুত হয়, তাহার তাড়িত-পরিচালন-শক্তি অত্যন্ত প্রবল। অতএব, অট্টালিকার উপর বজ্রাঘাত হইবার উপক্রম হইলে, তাহার কারণ যে তাড়িতপ্রবাহ, তাহা শীক দ্বারা সত্বর সঞ্চালিত হইয়া, পৃথিবী-গর্ত্তে প্রবাহিত হয়। ইহাতে গৃহে আর আঘাত হইতে পারে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বপ্নদর্শন,—কীর্ত্তি-বিষয়ক

আহা কি দেখিলাম! এমত অদ্ভুত স্বপ্ন কখনও দেখি নাই। এমত কলরব-পরিপূর্ণ লোকাকীর্ণ স্থানও কোথাও দৃষ্টি করি নাই। এই অসীম ভূমিখণ্ডের মধ্যস্থলে এক পরম শোভাকর অপূর্ব্ব পর্ব্বত দর্শন করিলাম। সে পর্ব্বত এত উচ্চ যে, তাহার শিখর নভো-মণ্ডলস্থ মেঘ-সমুদায় ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। তাহার পার্শ্ব-দেশ অত্যন্ত বন্ধুর ও দুরবরোহ; মনুষ্য-ব্যতিরেকে আর কোন জন্তুর তথায় আরোহণ করিবার সামর্থ্য নাই। আমি অতিশয় কৌতূহলা-ক্রান্ত হইয়া, কখন উর্দ্ধ-নয়নে পর্ব্বতের প্রতি একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিতেছিলাম, কখনও বা লোক-সমারোহ এবং তাহাদের বিবিধ-বিষয়ক যত্ন, চেষ্টা, ঔৎসুক্যাদি নিরীক্ষণ ও পর্য্যালোচন করত ইতস্ততঃ পদচারণা করিতেছিলাম।

এই আশ্চর্য্য অদ্ভুত ব্যাপারের আদ্যন্ত কিছুই অনুভব করিতে না পারিয়া, ম্রিয়মাণ হইতেছিলাম; এমতকালে এক পরম-সুন্দরী বিদ্যাধরী আমার ললাটদেশ বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ আমার সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া, কহিতে লাগিলেন,—"তুমি কি চিন্তা করিতেছ? এই প্রশস্ত ক্ষেত্রের নাম কর্ম্মক্ষেত্র, ঐ মহাশৈলের নাম কীর্ত্তিশৈল, উহার শিখর-দেশে কীর্ত্তি-দেবী অধিষ্ঠিত আছেন। যাবতীয় কীর্ত্তি-সেবকেরা তাঁহার সেবার্থে তৎসন্নিধানে গমন করিতেছে।" বিদ্যাধরী-সমীপে এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া,

আমি অপার আনন্দ অনুভব করিলাম, এবং কহিলাম,—“দেবি! তোমার অসম্ভাবিত অনুগ্রহ লাভ করিয়া, আমি কৃতার্থ হইলাম; এক্ষণে যদি অভয় দান কর, তবে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি; তুমি কে, আমাকে বিশেষ করিয়া বল।” তিনি কহিলেন,—“আমি বিদ্যাধরী, আমার নাম প্রজ্ঞা; তোমাকে অত্যন্ত চিন্তাকুল দেখিয়া, এখানে আবির্ভূত হইয়াছি। যদি কীর্ত্তিদেবীর মূর্ত্তি ও কীর্ত্তি-সেবকদিগের কৌতুক দর্শন করিবার বাসনা থাকে, আমার সমভিব্যাহারে আগমন কর, সমস্ত দর্শন করাইব।”

আমি বিদ্যাধরীর এই আশ্বাস-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, পরম পুলকিত-চিত্তে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইবামাত্র পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে ঘন ঘন বংশী-ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। আহা! সেই সুধাময় মধুর রব যাহাদের কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইল, তাহারা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহাদের চিত্ত-ভূমিতে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-নীর নিঃসৃত ও আশ্চর্য্য উৎসাহ-তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। ইহাতে তাহাদের মুখমণ্ডল এমন প্রফুল্ল ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল যে, বোধ হইল, যেন তাহারা মরণ-ধর্ম্মশীল মানব-স্বভাব অতিক্রম করিয়া, অমর-ভাব প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে স্থানে যে অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়াছিল, তন্মধ্যে অনেকেই সে সুধা-সিক্ত বংশী-রব শ্রবণ করে নাই, আর কতকগুলি লোক অল্প অল্প শ্রবণ করিয়াও তাহার সুমধুর রসাস্বাদ-পুরঃসর সুখানুভব করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহাতে আমি অত্যন্ত চমৎকৃত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, পরমারাধ্যা বিদ্যাধরীকে এ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি কহিলেন,—“ঐ বৃহৎ পর্ব্বতের পূর্ব্ব পার্শ্বে যে তিন প্রত্যন্ত পর্ব্বত দৃষ্টি করিতেছ, তাহার এক এক পর্ব্বতে এক একটা যক্ষ বাস করে। তাহারা

দেবতুল্য বেশ-ভূষা করিয়া, এক এক নিবিড় কুঞ্জে অবস্থিতি-পূর্ব্বক লোকের অন্তঃকরণ আকর্ষণ করে। সেই তিনটা যক্ষ যাহাদের অন্তঃকরণ অধিকার করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা অন্য বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে সমর্থ নয়। তাহাদের নাম কি জান? অজ্ঞান, আলস্য ও আমোদ।" বিদ্যাধরী যাহা বলিলেন, বাস্তবিকও তাহাই প্রত্যক্ষ হইল। সকল-জাতীয় যাবতীয় হীন-বুদ্ধি অকর্ম্মণ্য সামান্য মনুষ্য তগদত-চিত্তে সেই কুটিল-স্বভাব বিশ্ব-বঞ্চক যক্ষদিগের কুমন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া, তাহাদের প্ররোচন-বাক্যে মুগ্ধ হইয়া থাকিল। কেবল উন্নত-বুদ্ধি তেজীয়ান্ পুরুষেরা কীর্ত্তিদেবীর বংশীরব শ্রবণমাত্র মহোৎসাহ-প্রকাশ-পুরঃসর মহাশৈলে আরোহণার্থ উদ্যত হইলেন। সেই সুধাময় মধুর শব্দ তাঁহাদের কর্ণকুহরে যতই প্রবিষ্ট হইল, ততই মিষ্ট বোধ হইয়া, তাঁহাদের উৎসাহ-শিখা প্রজ্বলিত করিতে লাগিল।

দেখিলাম, তাঁহারা অত্যন্ত ঔৎসুক্য-সহকারে উল্লিখিত পর্ব্বতে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যে যে বস্তু সমভিব্যাহারে লইলে, সে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে সমর্থ হওয়া যায়, প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার কোন না কোন বস্তু সঙ্গে করিয়া চলিলেন। কেহ একখানি শাণিত প্রখর তরবার, কেহ কোন পরিপাটি পুস্তক, কেহ একটি সুন্দর দূরবীক্ষণ, কেহ বা এক গোলযন্ত্র ইত্যাদি প্রত্যেক ব্যক্তি এক এক সামগ্রী সঙ্গে করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ইহাতে দেখি, মনুষ্য-বিরচিত সমস্ত প্রধান বস্তু তথায় সংগৃহীত হইয়াছে। যাত্রীরা সকলে নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া, নানা পথে আরোহণ করিতে লাগিল; অনেকে এরূপ সঙ্কীর্ণ পথ অবলম্বন করিয়া চলিল যে, তদ্দ্বারা শিখর পর্য্যন্ত আরোহণ করিবার সম্ভাবনা নাই, কিয়দ্দূর উঠিয়াই স্থগিত হইতে হয়। ভূ-মণ্ডলস্থ

শিল্পকর ও গ্রন্থকার-দিগের মধ্যে বহুতর ব্যক্তি এই সকল সঙ্কীর্ণ পথের পথিক হইয়াছিলেন।

আমাদের বাম পার্শ্বে অন্য এক সম্প্রদায় দর্শন করিলাম। তাঁহারা অতি কুটিল বন্ধুর পথ অবলম্বন করাতে, সর্ব্বদা দিগ্‌ভ্রম হইয়া বিপথগামী হইতেছিলেন। তাঁহারা পরিশ্রম ও কর্ম্ম-দক্ষতা বিষয়ে অন্য কোন সম্প্রদায় অপেক্ষা ন্যূন না হইয়াও, অধিক দূর আরোহণ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। কেহ কেহ অনবরত এক প্রহর কাল ক্লেশ করিয়া যত দূর উত্থিত হইয়াছিলেন, সহসা একবার পদস্খলন হইয়া, নিমেষ-মাত্রে তাহার দ্বিগুণ পথ অধোগমন করিলেন। দেখি, রাজ-নিয়ম-ব্যবসায়ী কত শত সুবিখ্যাত ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মানস, জ্ঞানের সিংহাসন হরণ করিয়া, চতুরতা ও ধূর্ত্ততাকে প্রদান করেন।

এই সমস্ত অদ্ভুত-ব্যাপার দর্শন করিতে করিতে, অনেক দূর আরোহণ করিলাম। আরোহণ করিয়া দেখি, পর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তী অন্য অন্য যত পথ দৃষ্টি করিয়াছিলাম, সমুদায় আসিয়া, দুই প্রশস্ত পথে মিলিত হইয়াছে। সুতরাং সেই সমস্ত পথের সমুদায় যাত্রী এই দুই বৃহৎ পথে প্রবেশ করিয়া, দুই সম্প্রদায় হইল।

এই দুই প্রশস্ত পথের প্রবেশ-দ্বারের অনতিদূরে এক এক ভীষণাকার যক্ষ দণ্ডায়মান ছিল। তাহার এক জন ধূম্রবর্ণ, দীর্ঘ-দন্ত ও কুটিল-নেত্র; চর্ম্ম-পরিচ্ছদ * পরিধানপূর্ব্বক প্রকাণ্ড লৌহ-দণ্ড হস্তে করিয়া অবস্থান করিতেছিল। যাহারা তাহার সমীপস্থ পথে গমন করিতেছিল, তাহাদের সকলেরই সম্মুখভাগে সেই দণ্ড ঘন ঘন চালনা করিতে লাগিল। লোকে তাহা দেখিবামাত্র ভয়ে কম্পমান

* পুরাণে যমের এই প্রকার রূপ বর্ণনা আছে।

হইয়া পশ্চাদ্ভাগে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক 'মৃত্যু মৃত্যু' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। আর যে যক্ষ দ্বিতীয় পথের নিকটবর্ত্তী ছিল, তাহার নাম দ্বেষ। তাহার হস্তে যমদণ্ডের ন্যায় কোন সাঙ্ঘাতিক অস্ত্র ছিল না বটে, কিন্তু সে যে একপ্রকার বিকট ও উৎকট মুখভঙ্গি প্রকাশ করিয়া বিষপূরিত মৃদুস্বরে পর-পরীবাদ আরম্ভ করিল এবং অতি কুৎসিত ভ্রূভঙ্গি প্রদর্শন করিয়া, সকলের প্রতি যেরূপ বিষদৃষ্টি করিতে লাগিল, তাহাতে মৃত্যু অপেক্ষাও তাহাকে ভয়ানক জ্ঞান হইল। এমন কি, আমাদের সমভিব্যাহারী শত শত যাত্রী তাহার আকার দর্শনে ও বাক্য শ্রবণে ভগ্নোৎসাহ হইয়া, শৈলারোহণে নিবৃত্ত হইল। এই দুই রুক্ষস্বভাব যক্ষ দৃষ্টি করিয়া, আমার যেরূপ হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, তাহা বলিবার নয়। কিন্তু পূর্ব্ব-কথিত বংশীধ্বনি পুনঃ পুনঃ কর্ণগোচর হওয়াতে, অভিনব উৎসাহ-সঞ্চার ও সাহস বৃদ্ধি হইল, এবং তদ্দ্বারা হৃদয়-ভূমি ভীরুতা-রূপ কুজ্ঝটিকা হইতে ক্রমে ক্রমে নির্ম্মুক্ত হইতে লাগিল। যাহাদের হস্তে প্রখর তরবার ছিল, তাহারা স্পর্দ্ধা-পূর্ব্বক দর্প করিয়া, প্রথমোক্ত পথে প্রস্থান করিল। অবশিষ্ট সদ্বুদ্ধিবিশিষ্ট শিষ্ট ব্যক্তি সকল দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করিয়া, অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে গমন করিতে লাগিলেন। প্রথমে উভয় পথই কিঞ্চিৎ কষ্ট-দায়ক বোধ হইল, পরে যখন উল্লিখিত যক্ষদ্বয় আমাদের দৃষ্টি-পথের বহির্ভূত হইল, তখন উভয় পথই তত্তৎ-পথের পথিকদিগের সাতিশয় সুখ-দায়ক বোধ হইতে লাগিল। যদিও আমি দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করিয়াছিলাম, কিন্তু দূর হইতে প্রথম পথের ভাব ও তদীয় যাত্রীদিগের ব্যবহার এক এক বার অবলোকন করিলাম। বলিতে কি, তাহা কোন মতেই আমার মনঃপূত ও পরিশুদ্ধ বোধ হইল না।

তদনন্তর আমরা পরম প্রফুল্ল-চিত্তে সুমধুর বংশী-স্বর শ্রবণ-পুরঃসর অতিশয় উৎসাহ-সহকারে সুচারু কীর্ত্তিশৈল আরোহণ করিতে লাগিলাম। পথি-মধ্যে প্রায় সকলেই দুই একবার বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া উত্তীর্ণ হইলেন, এবং ক্রমে ক্রমে কৃত-কার্য্য হইয়া, শিখর-দেশে উপনীত হইলেন। আহা! সে স্থানের কি অপূর্ব্ব শোভা! কি মনোহর ভাব! তাহার শোভা এখনও আমার চিত্ত-পটে চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে। সে স্থানের সুন্দর সুস্নিগ্ধ সমীরণ কি নিরুপম-সুখদায়ক! তাহার প্রত্যেক হিল্লোলে সর্ব্বাঙ্গে সুবিমল সুখ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। আমাদের বোধ হইল, যেন কি অনির্ব্বচনীয় অমৃত-রসে অভিষিক্ত হইতেছি। তৎপ্রদেশের আর এক অপূর্ব্ব গুণ আছে, শুনিলে সকলে চমৎকৃত হইবেন। তথায় দণ্ডায়মান হইয়া, স্ব স্ব পূর্ব্ব-কৃত্য সমস্ত যত স্মরণ করা যায়, ততই অন্তঃকরণ আনন্দ-নীরে, নিমগ্ন হইতে থাকে। আমরা ইতস্ততঃ পদচারণা-পূর্ব্বক মধ্যদেশে এক অপূর্ব্ব অট্টালিকা অবলোকন করিয়া তদভিমুখে যাত্রা করিলাম। তাহার বহির্দ্বারোপরি "কীর্ত্তি-নিকেতন" এই কথাটি বৃহৎ বৃহৎ অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। তাহার চারি দিকে চারি রৌপ্যময় শুভ্রবর্ণ কবাট-সংযুক্ত প্রশস্ত দ্বার আছে এবং তাহার অভ্যন্তরে কীর্ত্তি-দেবী এক সুচারু সুবর্ণময় সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া, অনবরত বংশী-বাদন করিতেছেন। যাত্রিগণ শ্রবণ করিয়া, হর্ষ-সাগরে অবগাহন করিলেন; এবং বিবিধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া, আনন্দ-মনে উৎসাহ-সহকারে কীর্ত্তি-নিকেতনে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রতিদ্বারে পুরাবৃত্তবিৎ নামে কতকগুলি পণ্ডিত অবস্থিত ছিলেন। তাঁহারা অনেক ব্যক্তিকে সমভিব্যাহারে করিয়া, অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। ঐ সকল ব্যক্তি তাঁহাদের

সহায়তা-ব্যতিরেকে তথায় প্রবেশ করিতে কদাচ সমর্থ হইতেন না। ভূ-মণ্ডলের চারি খণ্ডের বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোক চারি দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেন; আমিও পরম কৌতুকাবিষ্ট হইয়া, কীর্ত্তি-নিকেতনে প্রবেশ-পুরঃসর সমস্ত সন্দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম; দেখিলাম, কীর্ত্তি-দেবী স্বর্ণময় সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া, সকলকে যথাসম্ভব সংবর্দ্ধনা-পূর্ব্বক সুমধুর-স্বরে এক এক আসন গ্রহণ করিতে কহিলেন। তাঁহারাও তৎক্ষণাৎ স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে এক এক আসনে উপবেশন করিলেন। কীর্ত্তি-দেবীর পরম পবিত্র সুরম্য শোভা দর্শন, তাঁহার পুষ্পালঙ্কারের সুচারু সুদূর-গামী সৌরভ গ্রহণ এবং তাঁহার সুধা-সিক্ত সুমধুর বংশীরব শ্রবণ করিয়া, সকলে এক-কালে মোহিত হইয়া গেল; তাঁহার শরীরের সৌগন্ধে সে স্থান অনবরত আমোদিত ছিল। আমি ইতস্ততঃ পদ-চারণ-পূর্ব্বক এক এক দিকের এক এক প্রকার মনোহর সৌরভ গ্রহণ করিয়া, পুলকে পরিপূর্ণ হইতে লাগিলাম। দেবীর বামপার্শ্বে কতিপয় দীর্ঘকায়, বৃষ-স্কন্ধ, মহাবল-পরাক্রান্ত, বীর-পদবী-বিশিষ্ট মনুষ্য শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, অকুতোভয়ে উপবিষ্ট আছেন; তাঁহাদের মুখ-শ্রীতে সাহস ও উৎসাহের সমুদায় লক্ষণ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে। আমি কোন কোন বলিষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ-পূর্ব্বক অতিশয় ঔৎসুক্য-সহকারে একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিতেছি দেখিয়া, আমার সমভিব্যাহারিণী বিদ্যাধরী কহিলেন,—"জান না? ইঁহারা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া, অত্যুৎকট দুরূহ ব্যাপার-সমুদায় সাধন করিয়াছেন। অবনী-মণ্ডলে ইঁহাদের পাণ্ডব ও কৌরব-পদবী প্রচারিত আছে।" কিন্তু প্রবলপ্রতাপান্বিত, প্রভূত-বলবিশিষ্ট, কতিপয় বিদেশীয় ব্যক্তিই সেই শ্রেণীর প্রধান আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। বিদ্যাধরী তাঁহাদের নাম ও গুণ কীর্ত্তন

করিলেন; বিদেশীয় লোকের নাম উত্তমরূপে স্মরণ থাকে না। একজনের নাম বুঝি আলেক্‌জাণ্ডর, একজনের নাম সীজর, আর একজনের নাম হানিবল ইত্যাদি। যে সমস্ত পুরাবৃত্তবিৎ পণ্ডিতেরা এই সকল যাত্রীকে সমভিব্যাহারে করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এক এক যাত্রীর পার্শ্ব-দেশে অবস্থান-পূর্ব্বক কীর্ত্তি-দেবীর সমীপে তাঁহার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন এবং সেই সুযোগে আপনারাও পরিচিত ও তাঁহার অনুগৃহীত হইলেন।

কীর্ত্তি-দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বের ভাব আর এক প্রকার। তথায় যে সমুদায় মহানুভব মনুষ্য বিরাজিত ছিলেন, তাঁহাদের প্রফুল্ল মুখমণ্ডল অবলোকন করিলে, শোকাচ্ছন্ন বিষণ্ণ জনেরও অন্তঃকরণ এক বার প্রফুল্ল হইতে পারে। তাঁহাদের সহাস্য বদন, সুধাময় মধুর বচন এবং আনন্দোৎফুল্ল চঞ্চল লোচন প্রত্যক্ষ করিয়া, আমি প্রীতিরূপ অমৃত-রসে অভিষিক্ত হইলাম। তাঁহারা কীর্ত্তি-দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন এবং কয়েকটি পরম সুন্দরী প্রিয়বাদিনী রমণী চিত্র-বিচিত্র অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ ও পরম-শোভাকর মনোহর অলঙ্কার ধারণ-পূর্ব্বক, তাঁহাদের সহযোগিনী-স্বরূপ অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহাদের কবি-পদবী সর্ব্বত্র প্রচলিত, এবং তাঁহাদের সহযোগিনী রমণীরা রাগিণী বলিয়া সর্ব্ব স্থানে বিখ্যাত। পূর্ব্বোক্ত বীরগণ যেমন এক এক পুরাবৃত্তবিৎ পণ্ডিতের সমভিব্যাহারে তথায় প্রবেশ করিয়াছেন, কবিদিগকে সেরূপ কাহারও আনুকূল্য অপেক্ষা করিতে হয় নাই; বরং তাঁহারাও অনেকানেক বীর্য্যবান্ ও গুণবান্ ব্যক্তির কীর্ত্তি-নিকেতন-প্রবেশ-বিষয়ের সহায়তা করিলেন। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব প্রধান; তাঁহাদের করস্থিত পুস্তকের কোন মনোহারিণী শক্তি আছে, দ্বারবানেরা তাহা দেখিবামাত্র তাঁহাদিগকে যত্ন-সহকারে

পথ প্রদান করিল। দুই শ্মশ্রু-ধারী সহাস্য-বদন প্রাচীন পুরুষ এই শ্রেণীর মধ্যস্থল-বর্ত্তী অপূর্ব্ব সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। প্রাচীনের মধ্যে এমন সুন্দর পুরুষ আর দৃষ্টি করি নাই। বিদ্যাধরী কহিলেন,—"এক জনের নাম বাল্মীকি, আর একজনের নাম হোমর।" দক্ষিণ ভাগে হোমর এবং তাঁহার বামভাগে বাল্মীকি এক এক খানি পরম রমণীয় পুস্তক হস্তে করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। বাল্মীকির বাম পার্শ্বে এক পরম রূপবান্ যুবা পুরুষ চিত্রিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, বিবিধ বর্ণ-বিভূষিত কুসুমাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ঐ আসনের সৌরভে সর্ব্বস্থান আমোদিত হইতেছিল। তিনি না কি উজ্জয়িনী-নিবাসী নৃপতি-বিশেষের সভাসদ থাকিয়া, নৃপতি অপেক্ষা শতগুণে কীর্ত্তি-দেবীর প্রিয় পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার বাম পার্শ্বে মাঘ, ভারবি, ভবভূতি, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি, স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে যথাক্রমে এক এক অশেষ শোভাকর উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ বাল্মীকির যেরূপ স্বভাব-সিদ্ধ সরল ভাব ও অকৃত্রিম অনুপম শোভা, তাঁহাদের কাহারও সেরূপ নহে। তাঁহাদের উত্তম শোভা আছে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেকেরই শরীরের সৌন্দর্য্য অপেক্ষায় বস্ত্রালঙ্কারের শোভা অধিক। কেহ কেহ আপন আপন পরিচ্ছদ এ প্রকার কুটিল ও জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন, যে, বহু যত্নে ও অনেক কষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া না দেখিলে, তাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আছে, তাহাও দৃষ্টি-গোচর হয় না। ও দিকে হোমরের পার্শ্বে বর্জ্জিল, ডাণ্টে, মিল্টন, সেক্সপিয়র, বায়রন্ প্রভৃতি শত শত রসার্দ্র-চিত্ত সুপ্রসিদ্ধ কবি যথাযোগ্য স্থানে অবস্থিত ছিলেন। সহৃদয় সেক্সপিয়র যে রত্নময় সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন, তাহা এই শ্রেণীর সকল আসন হইতে উন্নত ও জ্যোতিষ্মান্ বলিয়া প্রতীয়মান হইল। এই শ্রেণীর অত্যাশ্চর্য্য

অপূর্ব্ব শোভা অবলোকন করিয়া, আমার অন্তঃকরণ একেবারে মোহিত হইয়া গেল।

ইঁহারা সকলে বিচিত্র কথা-প্রসঙ্গে কালযাপন করিতেছিলেন; তন্মধ্যে বাল্মীকি ও কালিদাসের একটি কথা শ্রবণ করিয়া, অতিশয় দুঃখিত হইলাম। তাঁহারা কহিলেন,—"আমাদের স্বজাতীয় নব্য সম্প্রদায়ী যুবকদিগের মধ্যে অনেকে আমাদিগকে যথোচিত আদর অপেক্ষা না করিয়া, ভিন্নজাতীয় কবিদিগেরই অশেষ উপচারে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তবে সুখের বিষয় এই যে, ভিন্নজাতীয় পণ্ডিতেরা আমাদের প্রকৃত মর্য্যাদা জানিতে পারিয়া, বিশিষ্টরূপ শ্রদ্ধা-সহকারে যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকেন। দেখ, তাঁহারা আমাদিগকে যে প্রকার প্রকৃষ্ট পরিচ্ছদ প্রদান করিয়াছেন, আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে কখনও সেরূপ পরিধেয় পরিধান করি নাই। এখন তদ্দৃষ্টে স্বজাতীয় নব্য ব্যক্তিরাও কেহ কেহ আমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ প্রীতি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিতেছেন।"

অতঃপর যাঁহারা কীর্ত্তি-দেবীর সম্মুখস্থিত সিংহাসন-সমুদায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বিষয় বর্ণন করি। তাঁহারা সকলেই প্রায় ধ্যান-মগ্ন এবং সকলেরই ললাট-দেশ প্রশস্ত। পূর্ব্বে যাঁহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তি-ভাজন বলিয়া বিশ্বাস ছিল, তাঁহাদের সকলকেই সেই স্থানে দৃষ্টি করিয়া, আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলাম। যাঁহারা ভূ-মণ্ডলে জন্ম-গ্রহণ করিয়া, বিদ্যা-বিষয়ে বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন, তথায় তাঁহাদের সকলেরই সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। তথায় আমার সাতিশয় শ্রদ্ধাস্পদ আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য্য অম্লান-ভাবে প্রসন্ন-মনে বিরাজ করিতেছিলেন। প্রথমে, মহাত্মা আর্য্যভট্টকে কিছু ম্লান ও বিষণ্ণ দেখিয়াছিলাম; পরে অকস্মাৎ তাঁহার

মুখমণ্ডল প্রফুল্ল ও প্রদীপ্ত হইতে দেখিয়া বোধ হইল, তাঁহার কোন প্রিয়তর মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। বাস্তবিকও তিনি কয়েকটি অসামান্য ধী-শক্তি-সম্পন্ন মহানুভব মনুষ্যের প্রতি কটাক্ষপাত ও অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"পূর্ব্বে কেহই আমার যথার্থ মর্য্যাদা অবগত হইতে পারেন নাই; সুতরাং আমার কথায় আস্থা করা দূরে থাকুক, অত্যন্ত অশ্রদ্ধাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরন্তু এই সমস্ত বিদেশীয় বন্ধু আমার অভিপ্রায় অবলম্বন করিয়া, আমার শ্রম সার্থক ও মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।*" তিনি যে সমুদায় বিদেশীয় ব্যক্তিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ দ্বারা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, আমি তাঁহাদের পরিচয় লাভার্থ পরম কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, আমার সমভিব্যাহারিণী বিদ্যাধরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন,—"একজনের নাম কোপর্নিকস, একজনের নাম গালিলিয়, একজনের নাম নিউটন্ ইত্যাদি।" এই শেষোক্ত নাম শ্রবণ মাত্র, আমার অন্তঃকরণ পুলকিত ও শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে ইঁহাকে পৃথিবীর যাবতীয় মনুষ্য অপেক্ষা গরিষ্ঠ বলিয়া বোধ ছিল, এখানেও দেখিলাম, ইনি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ আসনে উপবিষ্ট আছেন। বেদব্যাস ও শঙ্করাচার্য্য এবং প্লেটো ও পিথাগোরসকেও দর্শন করিলাম। প্রথমে তাঁহারা সকলের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতেছিলেন, পরে ভূ-মণ্ডলের পশ্চিম-খণ্ড-নিবাসী কতকগুলি নব্য গ্রন্থকারের প্রখর মুখ-জ্যোতিঃ সহ্য করিতে না পারিয়া, এক পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলেন।

এইরূপ কত দেশের কত গুণবান্ ও বিদ্যাবান্ ব্যক্তিকে একত্র দৃষ্টি করিলাম, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। সকলের আপন গুণ ও মর্য্যাদানুসারে

* আর্য্যভট্ট পৃথিবীর আহ্নিক গতি স্বীকার করিতেন; কিন্তু তাঁহার পরে বরাহমিহির ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি তাহা স্বীকার করেন নাই।

আসন-গ্রহণ সম্পন্ন হইলে, তাঁহারা পর্য্যায়ক্রমে একে একে কীর্ত্তি-দেবীর স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ কহিলেন,—"দেবি! আমি লোকদিগকে শিক্ষাদানার্থে মানসিক ও কায়িক ক্লেশ করিয়া শরীর ক্লিষ্ট এবং অন্তঃকরণ নির্ব্বীর্য্য করিয়াছি। কিন্তু অনেকেই তদর্থে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন না, এবং কেহই তাহার পুরস্কার প্রদান করেন না। অতএব, মাতঃ! তোমার শরণাপন্ন হইয়া নিবেদন করিতেছি, তোমার সানুগ্রহ কটাক্ষপাত-ব্যতিরেকে ভূ-মণ্ডলে আমার আর কোন পুরস্কার প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।" কেহ কহিলেন,—"দেবি! আমি কেবল তোমার প্রসাদ-লাভ-প্রত্যাশায় এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি এবং অর্দ্ধরাত্র জাগরণ-পূর্ব্বক মনোহর কাব্য প্রস্তুত করিয়াছি; অতএব জননি! আমার প্রতি সকরুণ-নেত্রে কটাক্ষপাত কর।" যে সমস্ত মহাবীর দেবীর বাম ভাগে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা দণ্ডায়মান হইয়া, এইরূপ স্তব আরম্ভ করিলেন,—"দেবি! আমরা কেবল তোমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত ঘোরতর সঙ্কট-সমুদায়ে পতিত হইয়াছি। তোমার নিমিত্ত কত শত নগর শোণিত-প্রবাহে প্লাবিত করিয়াছি, কত শত গ্রাম অগ্নি-সংযুক্ত করিয়া দগ্ধ করিয়াছি এবং কত শত জাতির স্বাধীনতা-রত্ন হরণ করিয়াছি। অতএব, দেবি! অতঃপর তোমার পাদ-পদ্মে স্থান দান কর।" আমি শেষোক্ত লোকদিগের স্তোত্র-সমুদায় শ্রবণ-পূর্ব্বক দুঃখিত হইয়া, মনে মনে চিন্তা করিতেছিলাম। কি! ইঁহাদের মধ্যে অনেকে কীর্ত্তি-দেবীর সেবার্থে সর্ব্ব-সেবনীয় পরম পূজনীয় দেব-দেব ধর্ম্মকে অবহেলন ও কীর্ত্তি-শৈলে আরোহণার্থ পরম পবিত্র ধর্ম্মাচল পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন! ইতিমধ্যে আমার সমভিব্যাহারিণী হিতকারিণী বিদ্যাধরী কহিলেন,—"তুমিও কেন এই নিকেতনের এক আসন গ্রহণ করিয়া উপবেশন কর না।"

আমি কহিলাম,—"বিদ্যাধরি ! তুমি অনুকূল হইয়া আমাকে যে উপদেশ প্রদান করিলে, তাহা শিরোধার্য্য। কিছুমাত্র যশঃস্পৃহা না থাকিলেই বা কেন এত কষ্ট স্বীকার করিয়া, এ স্থানে উপস্থিত হইব ? কিন্তু যে সুখ্যাতি-প্রচার পরের বাগিন্দ্রিয়-পরিচালনার উপর নির্ভর করে, তাহার নিমিত্তে কোন স্থায়ী ধন বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত নহে। আমি কীর্ত্তি-দেবীকে কোন ক্রমে অশ্রদ্ধা করি না, এবং তাঁহার প্রসাদ-লাভার্থে ব্যাকুলও নহি। আমি, যে দেবতার যতদূর সেবা করা উচিত, তাহা করিব এবং দেবাধিপতি ধর্ম্মের আরাধনায় নিয়ত নিযুক্ত থাকিব ; ইহাতে কীর্ত্তিদেবী আমার প্রতি অনুকূল হইয়া, কৃপা-কটাক্ষ করেন, আমি সাতিশয় আগ্রহ-প্রকাশ-পূর্ব্বক তাঁহাকে হৃদয়-ধামে স্থান দান করিব। নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক থাকিয়া, যদি যাবতীয় লোকের অজ্ঞাত থাকি, সেও ভাল, পাপ-পঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া, কীর্ত্তি-লাভের অভিলাষী নহি।

এইরূপ চিন্তার বেগ প্রবল হওয়াতে, আমি সহসা জাগরিত হইয়া উঠিলাম। এখন নেত্র-উন্মীলন করিয়া দেখিতেছি, কোথায় বা কীর্ত্তি-শৈল, কোথায় বা কীর্ত্তি-নিকেতন ! আমি, যে সমস্ত অতি শ্রদ্ধেয় পরম পূজনীয় মূর্ত্তি দর্শন করিলাম, তাঁহারাই বা কোথায় ? পূর্ব্ব নিশায় যে শয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম, তাহাতেই পতিত রহিয়াছি। প্রভাত-সময়ের শিশির-সিক্ত সুকোমল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া, সর্ব্বাঙ্গের আবরণ-বস্ত্র কম্পিত করিতেছে ও সর্ব্বশরীর শীতল করিতেছে।

বিহঙ্গম-দেহ।

জগদীশ্বর পক্ষিগণের শরীর-নির্ম্মাণ-বিষয়ে যেরূপ কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উপমা দিবার স্থল নাই। তাহাদের যে অঙ্গের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা যায়, তাহাতেই তাঁহার নিরুপম নৈপুণ্য প্রতীয়মান হয়। তাহাদিগকে সতত বায়ু-সাগরে সন্তরণ করিতে হয়, এ নিমিত্ত পরমেশ্বর তাহাদিগের শরীর একখানি উৎকৃষ্ট তরণি-স্বরূপ করিয়াছেন। তাহাদের পক্ষ দণ্ড-স্বরূপ, পুচ্ছ কর্ণ-স্বরূপ এবং বক্ষঃস্থল নৌকার পুরোভাগ-রূপ। শরীর ভারী হইলে, তাহারা আকাশ-পথে উড্ডীয়মান হইতে অসমর্থ হইবে, এই বিবেচনায়, তিনি তাহাদের অঙ্গ-সমুদায় অত্যন্ত লঘু পদার্থে প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে অক্লেশে বায়ু ভেদ করিতে সমর্থ করিবার নিমিত্ত তাহাদের মস্তকের অগ্রভাগ অস্থূল ও চঞ্চুপুট সুতীক্ষ্ণ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

পক্ষিগণের চঞ্চু অতি আশ্চর্য্য বস্তু। যে পক্ষী যেরূপ দ্রব্য আহার করে, জগদীশ্বর তাহার চঞ্চু তদুপযোগী করিয়া দিয়াছেন। শ্যেন, শকুনি প্রভৃতি যে সকল পক্ষী অন্য প্রাণীর শরীর বিদীর্ণ করিয়া, আহার করে, ও শুক-শারিকাদি যে সমস্ত পক্ষী শস্য ভঞ্জন ও ফলাদি খণ্ডন করিয়া ভক্ষণ করে, তাহাদের চঞ্চু অত্যন্ত কঠিন করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু হংস, রাজহংসাদি যে সমস্ত পক্ষী পঙ্কের মধ্যে আহার অন্বেষণ করে, তাহাদের চঞ্চু কোমল ও চেপ্টা এবং এ প্রকার কৌশল-সহকারে নির্ম্মিত যে, তাহার মধ্য দিয়া জল নির্গত হয়, কিন্তু সার বস্তু পতিত হয় না। মাংসাশী পক্ষীদিগের চঞ্চুর পার্শ্ব-দেশ তীক্ষ্ণ এবং অগ্রভাগ বঁড়িশবৎ বক্রাকার। তাহারা তদ্দ্বারা নিহত পশু-পক্ষ্যাদির শরীর বিদারণ ও মাংসাদি উৎপাটন করিয়া ভক্ষণ করে;

আবার বক প্রভৃতি যে সমস্ত পক্ষী জলজন্তু ধরিয়া আহার করে, তাহাদের চঞ্চু কঠিন তীক্ষ্ণ ও দীর্ঘাকার। কিন্তু তাহাদিগকে যেমন নিহত জীবের শরীর হইতে মাংস উৎপাটন করিয়া ভক্ষণ করিতে হয় না, তেমন তাহাদের চঞ্চুও উল্লিখিত মাংস-ভোজী বিহঙ্গমদিগের চঞ্চুর ন্যায় বক্রাকার নহে। কপোত-চটকাদি গ্রাম্য পক্ষীদিগের চঞ্চু ছোট, সূচল ও ঈষদ্বক্র; তদ্দ্বারা তাহারা শস্যাদি ভোজ্য বস্তু অক্লেশে তুলিয়া লইতে পারে। এইরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, নিশ্চয় হয়, পক্ষীদিগের মধ্যে যে জাতি যেরূপ সামগ্রী ভক্ষণ করে, পরমেশ্বর তাহার তদুপযোগী চঞ্চু নির্ম্মাণ করিয়া, নিরুপম নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। কোন স্থলে এ নিয়মের কিছুমাত্র অন্যথা দেখা যায় না, যে স্থলে যেমন আবশ্যক, জগদীশ্বর সে স্থানে সেইরূপ করিয়াছেন।

তিনি যাবতীয় প্রাণীরই গ্রাসাচ্ছাদন-নির্ম্মাণ-বিষয়ে অদ্ভুত কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু পক্ষীদিগের শরীরের আচ্ছাদন যেমন পরিপাটি, এমন বুঝি আর কোন জন্তুরই নয়। ইহা যেমন লঘু, তেমনি মসৃণ, আবার তদনুরূপ শীত-নিবারক ও উষ্ণতা-সাধক। উহার বর্ণ ও শোভাই বা কেমন! পর্য্যাটকেরা অকস্মাৎ এক এক বন-বিহারী* বিহঙ্গমের অসামান্য সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া, মোহিত হইয়া যান।

এক একটি পালক এক এক অত্যাশ্চর্য্য অসামান্য শিল্পকার্য্য। উহার পূর্ব্বভাগ অর্থাৎ পুচ্ছদেশ যেরূপ লঘু, তদনুরূপ দৃঢ়। লঘুতা ও দৃঢ়তা এই উভয় গুণের এরূপ একত্র সমাবেশ আর কোন বস্তুতে দৃষ্ট হয় না। ঐ পূর্ব্বভাগের ন্যায় অপর ভাগও অতি আশ্চর্য্য। তাহা যে পদার্থে প্রস্তুত, ভূ-মণ্ডলের অন্য কোন প্রাণীতে ও কোন বস্তুতে তাহা বিদ্যমান নাই। উহা লঘু, দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য,

কোমল ও নমনীয়; অতএব ইচ্ছানুসারে সকল দিকে নত ও চালিত করা যায়; এবং স্থিতি-স্থাপক, অর্থাৎ উহাকে কোন দিকে নত অথবা চালিত করিয়া যদি ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে, পূর্ব্বে যে ভাবে ছিল, তৎক্ষণাৎ সেই ভাবে অবস্থিতি করে। পালকগুলি লঘু না হইলে, পক্ষিগণ উড়িতে সমর্থ হইবে না; এই বিবেচনায়, পরমেশ্বর উহাদিগকে লঘু করিয়াছেন। উহারা দৃঢ় না হইলে, বায়ুপ্রবাহ দ্বারা ভগ্ন হইয়া যাইবে; এই কারণে, উহাদিগকে দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য করিয়াছেন। উহাদিগকে পরিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত সকল দিকে চালনা করা আবশ্যক; এই বিবেচনায়, উহাদিগকে কোমল, শিথিল, নমনীয় ও স্থিতি-স্থাপক করিয়াছেন। বিশ্বপতি বিহঙ্গমজাতির শরীরের লঘুতা ও দৃঢ়তা একত্র সংসাধনার্থ কতই যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন। জগতের যে বস্তুর বিষয় উক্তরূপ বিবেচনা করা যায়, তাহাতেই তাঁহার অদ্ভুত কৌশল ও প্রগাঢ় যত্নের লক্ষণ প্রতীয়মান হয়। অপরিচ্ছিন্ন অসীম বিশ্বের কণামাত্রও তাঁহার অযত্নের বিষয় নয়।

উল্কা-পিণ্ড।

ইদানীং অনেকে মধ্যে মধ্যে অন্তরীক্ষ হইতে ধাতু-পিণ্ড-পাতের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকেন। সেই সমস্ত ধাতুপিণ্ড এই প্রস্তাবে উল্কাপিণ্ড বলিয়া লিখিত হইল। রাত্রি-কালে নভোমণ্ডলে মধ্যে মধ্যে যে নক্ষত্র-পাত দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাও বাস্তবিক উল্কা-পাত, নক্ষত্র-পাত নয়। এক একটি নক্ষত্র পৃথিবী অপেক্ষাও কত-লক্ষ গুণ বৃহৎ, তাহা বলা যায় না। সে সমুদায় পৃথিবীর উপর পতিত হইলে, পৃথিবীর প্রলয়াবস্থা উপস্থিত হয়। উল্কাপিণ্ড পতিত বা চালিত হইবার সময়ে নক্ষত্রবৎ প্রতীয়মান হয়। ১৭৭২ সতের শত

বায়ত্তর শকের ১৬ ষোলই অগ্রহায়ণে দিবা দ্বিপ্রহর তিন ঘণ্টার সময়ে বিষ্ণুপুরের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে একটি উল্কাপিণ্ড পতিত হয়; তাহা কলিকাতার আসিয়াটিক সোসাইটী-নামক সমাজের চিত্র-শালায় আনীত হইয়া রক্ষিত হইয়াছে। প্রতিবর্ষে কত স্থানে ঐরূপ কত উল্কা-পিণ্ড পতিত হয়, তাহার সংখ্যা করিবার উপায় নাই। এক এক দিন লক্ষ লক্ষ উল্কা-পিণ্ড আকাশ-মণ্ডলে আবির্ভূত হইতে দেখা গিয়াছে।

ঐ সমস্ত উল্কা-পিণ্ড পতিত হইবার সময়ে, অন্তরীক্ষে একটা সুদীর্ঘ অগ্নি-শিখা চলিয়া যায়। তৎক্ষণাৎ একটা মহাশব্দ উৎপন্ন হয়। কখন কখন এ প্রকার ভয়ঙ্কর ধ্বনি উৎপাদিত হইয়া থাকে যে, ঘর, দ্বার, প্রাচীর প্রভৃতি কম্পিত হইয়া উঠে। ইতিপূর্ব্বে বিষ্ণুপুরের নিকট যে উল্কা-পিণ্ড পতিত হইবার বিষয় উল্লিখিত হইল, তাহা পতিত হইবার সময়ে, কামানের শব্দের ন্যায় ভয়ানক শব্দ শ্রুত হইয়াছিল। কখন কখন নির্ম্মল নভোমণ্ডলে অকস্মাৎ একখানি ঘোরতর মেঘ উপস্থিত হইয়া, অতি গভীর শব্দ-পরম্পরা উৎপন্ন হয় এবং সেই সঙ্গে বহু-সংখ্যক উল্কা-পিণ্ড বর্ষিত হইতে থাকে। এক এক সময়ে ঐরূপ মেঘ হইতে সহস্র সহস্র উল্কা-পিণ্ড পতিত হইতে দৃষ্টি করা গিয়াছে।

উল্কা-পাতের সময়ে শিখা দেখা যায় ও শব্দ হইয়া থাকে; ইহা বহুকালাবধি প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু নভোমণ্ডল হইতে যে স্থূলাকার উল্কা-পিণ্ড পতিত হয়, ইহা সেরূপ প্রসিদ্ধ ছিল না। কিন্তু এক্ষণে সে বিষয়ে আর সংশয় নাই। ইহা পতিত হইবার সময়ে উষ্ণ থাকে। ১৮৩৫ আঠার শত পঁয়ত্রিশ খৃষ্টাব্দের ১৩ তেরই নবেম্বর ফরাশিশ দেশে উল্কাপাত হইয়া, একটি শস্যাগার একে বারে দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

রাত্রিকালে অগ্নি-শিখার ন্যায়ই পতিত হউক, আর দিবাভাগে দীপ্তিশূন্য হইয়াই বা বর্ষিত হউক, সমুদায় উল্কা-পিণ্ড একরূপ পদার্থে পরিপূর্ণ। লৌহ, তাম্র, টীন, গন্ধক, নিকল, কোবাল্ট, সোডা প্রভৃতি, ত্রয়োদশটি পার্থিব বস্তু উল্কাপিণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীতে যে বস্তু নাই, সে বস্তু উহাতে দৃষ্ট হয় না। পৃথিবীতে খনির মধ্যে বিশুদ্ধ লৌহ ও বিশুদ্ধ নিকল ধাতু প্রাপ্ত হওয়া যায় না; উহাদের সহিত অন্য বস্তু মিশ্রিত থাকে, পরে পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হয়। কিন্তু উল্কা-পিণ্ডে যে লৌহ ও নিকল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বিশুদ্ধ। তাহার সহিত অন্য কোন পদার্থ মিশ্রিত থাকে না। পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে, উল্কা-পিণ্ড পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হয় নাই, উহারা পৃথিব্যাদি গ্রহগণের ন্যায় সূর্য্য-মণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করে। পৃথিবী-মণ্ডলে যে সমুদায় পদার্থ আছে, যখন উল্কা-পিণ্ডেও কেবল তাহারই কোন কোন পদার্থ বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়, তখন গ্রহ ও উপগ্রহগণও পার্থিব পদার্থে প্রস্তুত হওয়া সম্ভব বলিয়া প্রতীত হইতে পারে।

সকল উল্কা-পিণ্ড সমানরূপ বৃহৎ নয়। ছোট বড় নানাপ্রকার দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ব্রেজিল রাজ্যের অন্তঃপাতী বেহিয়া নামক স্থানে একটা উল্কা-পিণ্ড পতিত আছে, তাহার ব্যাস ন্যূনাধিক ৫ পাঁচ হস্ত হইবে। লিখিত আছে, গ্রীসদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত সক্রেটিস্ যে বৎসর জন্মগ্রহণ করেন, সেই বৎসর সে দেশের ইগস্ পোটেমস্ নামক নগরে এক বৃহৎ উল্কা-পিণ্ড পতিত হয়। তাহা এত বৃহৎ যে একখানি শকট তাহাতে সম্পূর্ণরূপে বোঝাই হইতে পারে। খৃষ্টীয় শকের দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে নাণি-নামক নগরের নিকটবর্ত্তিনী নদীতে একটি উল্কা-পিণ্ড পতিত হয়; উহা এত বৃহৎ

যে, জলের উপর চারি ফুট জাগিয়া ছিল। মোসলমানদিগের মধ্যে এরূপ জন-প্রবাদ প্রচলিত আছে, চীন-রাজ্যের পশ্চিমখণ্ডে হরিম্নদীর প্রস্রবণ-সন্নিধানে একটি কৃষ্ণবর্ণ উল্কা-পিণ্ডের কিয়দংশ পতিত আছে, সেই পিণ্ড ২৭ সাতাইশ হস্ত উচ্চ।

উল্কা-পিণ্ড চতুর্দ্দিকে যে দাহ্য পদার্থে পরিবেষ্টিত থাকে, তাহা লইয়া পরিমাণ করিলে, উহা অতি বৃহৎ বলিতে হয়। কোন কোনটার ব্যাস ৫০০ পাঁচ শত ফুট, কোন কোনটার বা ১,০০০ এক সহস্র ফুট, কোন কোনটার ব্যাস তদপেক্ষাও অধিক দেখা গিয়াছে। সার্ চার্লস্ ব্লাগডেন্ নামক ইউরোপীয় পণ্ডিত ১৭১৩ সতরশ তের খৃষ্টাব্দের ১৮ আঠারই জানুয়ারিতে একটা উল্কা দৃষ্টি করেন, তাহার ব্যাস ২,৬০০ দুই হাজার ছয়শ ফুট হইবে।

সৌর-জগতে কত কোটি উল্কা-পিণ্ড নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। মধ্যে মধ্যে একেবারে এত উল্কাপাত হয়, যে তাহা দেখিলে ও শুনিলে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকিতে হয়। আরবীয় ইতিহাসবেত্তারা বর্ণন করিয়াছেন, যে রাত্রে ইব্রাহিম্ বেন্ আম্মাদ-নামক নরপতি প্রাণত্যাগ করেন, সেই রাত্রে বহুসংখ্যক নক্ষত্র পতিত হয়। ঐ নক্ষত্র-পাত অগ্নি-বৃষ্টি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রকারেরা গ্রন্থ-বিশেষে মধ্যে মধ্যে যে অগ্নি-বর্ষণের প্রসঙ্গ করিয়াছেন, তাহা ঐরূপ কোন উল্কাপাত দৃষ্টে উদ্বোধিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এরূপ ইতিহাস আছে, ১০৯৫ দশশ পঁচানব্বই খৃষ্টাব্দের ২৫ পঁচিশে এপ্রেল ফরাশিদিগের দেশে শিলাবৃষ্টির ন্যায় নক্ষত্র-বৃষ্টি হইয়াছিল। এইরূপ লিখিত আছে, ১২০২ বারশ দুই খৃষ্টাব্দের ১৯ উনিশে অক্টোবরের সমস্ত রাত্রি শলভ-বর্ষণের ন্যায় নক্ষত্র-বর্ষণ হইয়াছিল। ১৩৬৬ তেরশ ছেষট্টি

খৃষ্টাব্দের ২১ একুশে অক্টোবরে রাত্রি-শেষে একেবারে এত নক্ষত্র-পাত হয় যে, কেহই তাহা গণনা করিতে সমর্থ হয় নাই।

১৮৩৩ আঠারশ তেত্রিশ খৃষ্টাব্দের ১২ বারই নবেম্বরে আমেরিকায় হইতে যে অদ্ভুত উল্কা-পুঞ্জের আবির্ভাব দৃষ্ট হয়, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়-জনক। ঐ দিবস রাত্রি নয় ঘণ্টা অবধি পরদিবস সূর্য্যোদয়ের পরক্ষণ পর্য্যন্ত উল্লিখিত বিস্ময়কর ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। অগ্নি-ক্রীড়ায় নক্ষত্র রাজির ন্যায় অসঙ্খ্য উল্কা-পিণ্ড আবির্ভূত হইয়া, চক্ষুর্গোচর সমস্ত নভঃ-প্রদেশ আচ্ছন্ন করিয়াছিল। সে সমুদায় যতক্ষণ অতিশয় অবিরল দৃষ্ট হইয়াছিল, ততক্ষণ কাহারও তাহা গণনা করিবার সম্ভাবনা ছিল না। অনন্তর যখন কিছু বিরল হইয়া আসিল, তখন বোষ্টন নগরস্থ এক পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিলেন, প্রতি ঘণ্টায় ৪০,০০০ চল্লিশ সহস্র উল্কা-পিণ্ড আবির্ভূত ও চলিত হইতেছে। ক্রমাগত সাত ঘণ্টা ঐরূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষ হয়। অতএব বলিতে হয়, ২,৮০,০০০ দুই লক্ষ অশীতি সহস্র উল্কা-পিণ্ড ঐ রজনীতে মনুষ্যদিগের দৃষ্টি-পথে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু যে সময় উল্কার সংখ্যা অনেক ন্যূন হইয়া আসিয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে তদপেক্ষায় অধিকসংখ্যা দৃষ্টিগোচর হয়। অতএব, ইহা অনায়াসেই বলিতে পারা যায়, উক্ত রজনীতে সৌর জগতের অন্তর্গত ৩,০০,০০০ তিন লক্ষ জড়ময় উল্কা-পিণ্ড আমেরিকার ঊর্দ্ধ দেশ দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। বিশ্বপতির বিশ্ব-ভাণ্ডারে কত অদ্ভুত বস্তু প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? কেবল কয়েকটি গ্রহ, চন্দ্র ও ধূমকেতু মাত্রই সৌর-জগতে বিদ্যমান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। অসংখ্য উল্কা-পিণ্ড যে তাহার অন্তর্গত থাকিয়া, নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা কিছু দিন পূর্ব্বে আমাদের স্বপ্নেরও গোচর ছিল না।

উল্কা-পিণ্ডের গতির বিষয় বিবেচনা করিলেও বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ভূমণ্ডলস্থ কোন বস্তুর তাদৃশ সত্বর গতি দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৭৯৮ সতরশ আটানব্বই খৃষ্টাব্দে ২ দুইটি উল্কা-পিণ্ডের বেগ নিরূপিত হয়; তন্মধ্যে একটির গতি প্রতিপলে ১৬৪ একশ চৌষট্টি ক্রোশ, দ্বিতীয়টির বেগ প্রতিপলে ১৭৯ একশ উনআশি ক্রোশের ন্যূন ও ২২২ দুইশ বাইশ ক্রোশের অধিক নয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ দুইটির মধ্যে একটি ভূতলের দিকে অবতীর্ণ হইয়া, পুনরায় ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইতে দৃষ্ট হইয়াছিল। ১৮২৩ আঠারশ তেইশ খৃষ্টাব্দে ২৭ সাতাইশটি উল্কা-পিণ্ডের গতি ও পথ নিরূপিত হয়; তন্মধ্যে এক একটির বেগ প্রতিপলে ৩৮০ তিনশ আশি ক্রোশ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ১৮৩৮ আঠারশ আটত্রিশ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট সুইজর্লণ্ড দেশে অনেকগুলি উল্কা পিণ্ড পর্য্যবেক্ষিত হয়। তাহাদের বেগ প্রতিপলে গড়ে ২,৩২৩ তেইশ শ তেইশ ক্রোশ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। গ্রহগণের গতির সহিত তুলনা করিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, ঐ সকল উল্কা-পিণ্ড বুধ গ্রহ অপেক্ষা সাড়ে সাত গুণ এবং পৃথিবী অপেক্ষা ১১ এগার গুণ প্রবলতর বেগে পরিভ্রমণ করে। অনেকানেক ধূমকেতুও উক্তরূপ সত্বরগামী নয়।

ঐ সমস্ত উল্কা-পিণ্ড ভূমণ্ডল হইতে কত ঊর্দ্ধে উদিত হয়, তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত, পণ্ডিতেরা অনেক যত্ন ও অনেক আয়াস পাইয়াছেন, এবং গণনা করিয়া, কতকগুলির উৎসেধাঙ্ক নির্দ্ধারণও করিয়াছেন। এ বিষয়ে অতিমাত্র বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোনটার উৎসেধ ৩ তিন ক্রোশ কোনটার বা ৭০ সত্তর ক্রোশ, কোনটার ১৪০ এক শত চল্লিশ ক্রোশ, কোনটার বা ২৩০ দুইশত ত্রিশ ক্রোশ অপেক্ষাও অধিক। ১৮৩৮ আঠারশ আটত্রিশ খৃষ্টাব্দে সুইজর্লণ্ড

দেশে যে সমস্ত উল্কা-পিণ্ড পর্য্যবেক্ষিত হয়, তাহাদের উৎসেধ ২৭৫ দুইশত পঁচাত্তর ক্রোশ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে।

কখন কখন উল্কা-পাতের সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, উহার শিখা আবির্ভূত হইবামাত্র অমনি তিরোহিত হয়। কিন্তু কোন কোন উল্কা-পিণ্ডের শিখা ১৭ সতর ২৫ পঁচিশ ও ৩৭ সাঁইত্রিশ পল পর্য্যন্ত প্রকাশিত থাকিতে দেখা গিয়াছে। কোন রণপোতাধ্যক্ষ অর্ণব-যান আরোহণ করিয়া, ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতে করিতে এক স্থানে একটি উল্কা-পিণ্ড দৃষ্ট করিয়াছিলেন। সেই উল্কা-পিণ্ড তিরোহিত হইবার পর তাহার শিখা এক ঘণ্টা স্থির হইয়াছিল। নভোমণ্ডলের যে অংশে পৃথিবীর ছায়া পতিত হয়, যখন সেই অংশে ঐ ছায়ার মধ্যেও উল্কার আভা দৃষ্ট হয়, তখন ঐ আলোক উহার নিজের আলোক বই আর কি বলিতে পারা যায়? গ্রহ-চন্দ্রাদি যেমন সূর্য্যের তেজ প্রাপ্ত হয় বলিয়া তেজোময় দেখায়, উল্কা-পিণ্ড সেরূপ বোধ হয় না।

উল্কা-পিণ্ড কিরূপে কোথা হইতে পতিত হয়, এই বিষয় লইয়া, পদার্থবিৎ পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। কেহ কহিতেন, উহা বায়ুমধ্যস্থিত বস্তু-বিশেষের সংযোগে উৎপন্ন হয়। কেহ বলিতেন, উহা আগ্নেয়-গিরি হইতে নির্গত হইয়া থাকে। কেহ বা উহা চন্দ্রলোক হইতে পতিত হয়, বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কিন্তু ইদানীন্তন পণ্ডিতবর্গ উল্লিখিত অভিপ্রায়-ত্রয় নিরাকরণ করিয়া, মীমাংসা করিয়াছেন, গ্রহ ও ধূমকেতু সমুদায় যেমন নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সূর্য্য-মণ্ডল প্রদক্ষিণ করে, ঐ সমুদয় উল্কা-পিণ্ড সেইরূপ নিয়ম-বদ্ধ থাকিয়া, সূর্য্য-মণ্ডলের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে এবং ভ্রমণ করিতে করিতে যখন ভূ-মণ্ডলের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন তৎকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া, ভূ-তলে আসিয়া উপস্থিত হয়। বৎসরের মধ্যে এক

এক সময়ে অধিক-সংখ্যক উল্কা-পিণ্ড দৃষ্টিগোচর হয়। পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন, তাহারা নভোমণ্ডলের যে প্রদেশ দিয়া ভ্রমণ করে, পৃথিবীও সেই সেই সময়ে সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী হওয়াতে, পৃথিবীস্থ লোকেরা অনায়াসেই তাহাদিগকে দেখিতে পায়। ৮ আটই আগষ্ট অবধি ১৫ পনরই আগষ্ট পর্য্যন্তই এবং ৬ ছয়ই নবেম্বর অবধি ১৯ উনিশে নবেম্বর পর্য্যন্তই অধিক উল্কা দৃষ্ট হইয়া থাকে। নবেম্বর মাসের ১২ বারই ১৩ তেরই তারিখে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক উল্কাপিণ্ড আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়।

ইদানীন্তন অনেকানেক প্রধান জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন, চন্দ্র যেমন নিরূপিত সময়ের মধ্যে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, সেইরূপ কতক উল্কা-পিণ্ড কালক্রমে পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইয়া, যথানিয়মে উহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফরাশিশ রাজ্যের অন্তঃপাতী তুলস নগরস্থ মান-মন্দিরের অধ্যক্ষ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, এরূপ একটি বৃহত্তর উল্কা-পিণ্ড ধরাতল হইতে ২,২০০ দুই সহস্র দুইশত ক্রোশ উর্দ্ধে অবস্থিত থাকিয়া, ৮ আটদণ্ড ২০ কুড়ি পলে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে; সুতরাং বলিতে হয়, উহা পৃথিবীকে প্রতিদিন প্রায় ৭ সাত বার প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে।

১৮৬২ আঠারশ বাষট্টি ও ১৮৬৬ আঠারশ ছষট্টি খৃষ্টাব্দে যে সমস্ত ধূমকেতু দৃষ্ট হয় এবং মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের ভ্রমণ পথের মধ্যে থাকিয়া যে সমুদয় কনিষ্ঠ গ্রহ সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে, সে সমুদায় বৃহৎ বৃহৎ উল্কা-পিণ্ড বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। শনিগ্রহের বলয়ত্রয়ও ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জড়পিণ্ডে বিরচিত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

বায়ু-সেবন ও গৃহ-পরিমার্জ্জন।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা বায়ুকে জগৎপ্রাণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বাস্তবিক উহা পৃথিবীস্থ জীবগণের জীবনস্বরূপ তাহার সন্দেহ নাই। অন্ন, জল, ব্যতিরেকে দুই এক দিবস অতিক্রম করিতে সমর্থ হওয়া যায়, কিন্তু বায়ু-ব্যতিরেকে ক্ষণমাত্র প্রাণ ধারণ করা যায় না। ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম-নিষ্ঠ ব্রতধারী ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে নবরাত্র করিয়া, অর্থাৎ নয় দিবস নিরশন থাকিয়া, জীবিত থাকেন, শুনা গিয়াছে; কিন্তু নির্ব্বাত স্থানে নয় পল মাত্র অবস্থিতি করিতে হইলে, মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। যে সমস্ত পথিক ও বণিক বালুকাময় মরুভূমি পর্য্যটন করে, তাহারা জলপান-ব্যতিরেকে ১০।১৫ দশ পনর ক্রোশ অনায়াসেই ভ্রমণ করিতে পারে, কিন্তু নির্ব্বাত স্থান দিয়া ১০।১৫ দশ পোনের পদও গমন করিতে সমর্থ হয় না। অতএব, বায়ু আমাদিগের জীবন-রক্ষার্থ যেমন আবশ্যক, অন্য কোন বস্তু সেরূপ নয়। অন্ন, জল ও জ্যোতি আবশ্যক বটে, কিন্তু বায়ুর তুল্য নয়। বায়ু পৃথিবীস্থ জীবের সাক্ষাৎ প্রাণস্বরূপ।

কিন্তু সকল স্থানের বায়ু সমানরূপ উপকারী নয়। বিশুদ্ধ বায়ুই প্রকৃতরূপ উপকারী। যেমন, দুর্গন্ধ জল পান করিলে ও গলিত ফল ভক্ষণ করিলে রোগ জন্মে, সেইরূপ অবিশুদ্ধ দুষ্ট বায়ু সেবন করিলেও রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে। যিনি কলিকাতা নগরীর পথ-প্রান্তবর্ত্তিনী জলপ্রণালীর নিকটস্থিত দুর্গন্ধ বায়ু নিশ্বাস সহকারে শরীরস্থ করিয়াছেন, এই নগরীর লোক কি জন্য রুগ্ন শীর্ণ ও শ্রীভ্রষ্ট, তাহা তাঁহার অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে। *

* এখন ইহার বিস্তর পরিবর্ত্তন হইয়া অনেক পরিমাণে দুর্গন্ধ নিবারণ হইয়াছে। এটি সুখের বিষয়, তাহার সন্দেহ নাই।

প্রত্যুত, যে ব্যক্তি প্রাতঃকালীন সুস্নিগ্ধ বিশুদ্ধ সমীরণ সেবন করিয়া, হৃদয়-পদ্ম বিকসিত করিয়াছেন, চৌরঙ্গী-নিবাসী ইউরোপীয় লোক কি নিমিত্ত হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ, তাহাও তাঁহার প্রতীত হইতে পারে।

শরীরের মধ্যে অবিশ্রান্ত রক্ত চলিতেছে। সেই রক্ত চলিতে চলিতে শরীরস্থ অন্যান্ত দুষ্ট পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া দূষিত হইতেছে; পরে অপর্য্যাপ্ত বায়ু নিশ্বাস-সহকারে দেহমধ্যে নীত হইয়া, সেই দূষিত রক্ত সংস্কৃত করিতেছে। যদি কোন অহিতকারী পদার্থ ঐ বায়ু-সমভিব্যাহারে সতত শরীরমধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে, আশু বা বিলম্বে রোগ জন্মে, তাহার সন্দেহ নাই।

বায়ু নানা কারণে ও নানা প্রকারে দূষিত হইতে পারে। মনুষ্যের শ্বাস-প্রশ্বাস উহার এক প্রধান কারণ। আমরা যে বায়ু নাসিকা দ্বারা আকর্ষণ করিয়া শরীরস্থ করি, তাহা শরীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া, বিকার প্রাপ্ত হইয়া বহির্গত হয়। ইহা নাসিকা-রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইবার সময়ে আমাদিগের প্রাণ-ধারণের উপযোগী থাকে; পরে প্রাণ-সংহারের উপযোগী হইয়া বাহির হইয়া আইসে। ইহার প্রাণ-ধারণ-গুণ নষ্ট হইয়া, প্রাণ-হরণ-গুণ উৎপন্ন হয়। ঐ বিষতুল্য বিকৃত বায়ু শরীর হইতে বাহির হইয়া যে বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়, তাহা আমাদিগের পক্ষে অত্যন্ত অহিতকারী। তাহা সেবন করা কর্ত্তব্য নয়।

বিশুদ্ধ বায়ু শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা উক্তরূপ বিকার প্রাপ্ত হয়, ইহা অক্লেশে পরীক্ষা করিয়া সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। চুণের জলে সামান্ত বায়ু ব্যজন করিলে, সে জলের কিছুমাত্র রূপান্তর হয় না, যেমন তেমনই থাকে। কিন্তু ফুৎকার দিলে, উহা অবিলম্বে

মলিন হইয়া উঠে। যে অহিতকারী পদার্থ নিশ্বাস-সহকারে শরীর হইতে বহির্গত হয়, তাহা চূণের জলে মিলিত হইলে, সে জল ঐরূপ আবিল হইয়া থাকে।

আমরা যে গৃহে অবস্থিতি করি, সে গৃহের বায়ু শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা অনবরতই উক্তরূপ দূষিত হইতে থাকে। যদি বাহিরের বায়ু প্রবাহিত হইয়া, ঐ দূষিত বায়ুকে অপসারিত করিয়া না দেয়, তাহা হইলে, ঐ বায়ু ক্রমশঃ বিষতুল্য হইয়া উঠে। উহা সেবন করিলে, অবিলম্বেই মৃত্যুগ্রাসে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা। নবাব সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি মাণিকচাঁদ কলিকাতার দুর্গমধ্যে দৈর্ঘ্যে ১২ বার হস্ত ও প্রস্থে ৯ নয় হস্ত প্রমাণ একটি প্রকোষ্ঠে ১৪৬ একশ ছচল্লিশ জন ইংরাজকে সমস্ত রাত্রি রুদ্ধ করিয়া রাখাতে যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অনেকেই বিদিত আছেন। ঐ প্রকোষ্ঠের এক দিকে একটি মাত্র বাতায়ন ছিল; সুতরাং আবশ্যকমত বায়ু সঞ্চারের উপায় ছিল না। উল্লিখিত বন্দী সকলের নিশ্বাসে উক্ত গৃহের সমস্ত বায়ু অতি শীঘ্র ভ্রষ্ট হইয়া গেল, তাহারা অবিলম্বেই পিপাসায় অস্থির হইল, গাত্রদাহে দগ্ধ হইল এবং বায়ুবিরহে অধীর হইতে লাগিল। সকলেই কিঞ্চিৎ বায়ু লাভের প্রত্যাশায় ব্যাকুল হইয়া, ঊর্দ্ধস্থ বাতায়নের নিকটস্থ হইবার জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিল এবং "বন্দুক করিয়া আমাদের যন্ত্রণার পর্য্যবসান কর" বলিয়া রক্ষকদিগের নিকট ব্যগ্রতা-সহকারে প্রার্থনা করিতে লাগিল। পরিশেষে এক এক করিয়া হতচেতন হইয়া, ধরণীতলে পতিত হইল, এবং অবশিষ্ট সকলে তাহাদের মৃত শরীরোপরি দণ্ডায়মান হইয়া, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বায়ু প্রাপ্ত হইতে লাগিল। পর দিন প্রাতঃকালে দ্বারোদ্ঘাটন হইলে, দৃষ্ট হইল ১৪৬

একশ ছচল্লিশ জনের মধ্যে ২৩ তেইশ জন মাত্র তখন পর্য্যন্ত জীবিত আছে, অবশিষ্ট সকলেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

নাসিকার ন্যায় লোম-কূপ দ্বারাও শরীরস্থ অনিষ্টকারী পদার্থ-সমূহ নিয়ত বহির্গত হয়। অতএব তদ্দ্বারাও গৃহের বায়ু ক্রমাগত দূষিত ও অবিশুদ্ধ হইয়া থাকে। কখন কখন এমন দূষিত হয় যে, তদ্দ্বারা এক প্রকার দুঃসহ দুর্গন্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। শিশির-কালে উষা-কালীন বিশুদ্ধ বায়ু সেবনপূর্ব্বক কোন ব্যক্তির শয়নগৃহের কবাট উদ্‌ঘাটন করিয়া, তাহার শয্যার নিকট গমন করিলে, এরূপ দুর্গন্ধ অনুভূত হয় যে, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বহির্গত হইবার জন্য ব্যস্ত হইতে হয়।

এইরূপে নিশ্বাস-ক্রিয়া, স্বেদ-নিঃসরণ, রন্ধন-ধূম, দুর্গন্ধ বস্তুর বাষ্পোদ্গম ইত্যাদি অনেক কারণ দ্বারা গৃহের বায়ু অবিরত দূষিত হইয়া, গৃহবাসীদিগের পক্ষে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হইতে থাকে। অতএব যাহাতে গৃহমধ্যে সতত বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চার থাকে অর্থাৎ বাহিরের বিমল বায়ু গৃহের মধ্যে সর্ব্বদা সঞ্চারিত হইয়া, তথাকার দূষিত বায়ু বহির্গত করিয়া দেয়, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য।

তাহার উপায় করা কঠিন কর্ম্ম নয়। বায়ু আমাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, করুণাময় পরমেশ্বর উহা সর্ব্বত্র প্রচুর রাখিয়া দিয়াছেন। উহা সকল স্থানে, সকল গৃহে ও সকল রন্ধ্রেই সর্ব্বক্ষণ বিদ্যমান রহিয়াছে। পথ, ঘাট, গৃহ, কানন, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি যে কোন স্থানে আমাদের অবস্থিতি করা আবশ্যক হয়, তাহাই বায়ুরাশিতে পরিপূর্ণ। মৎস্য, কুম্ভীর, হাঙ্গর প্রভৃতি জল-জন্তু যেমন জলাশয় মধ্যে নিমগ্ন থাকে, আমরাও সেইরূপ সুগভীর বায়ুরাশিতে মগ্ন হইয়া রহিয়াছি। অতএব বায়ু যেমন

সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক, তেমনি সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। কিন্তু কেমন দুর্ভাগ্যের বিষয়, পরমেশ্বরের করুণাময় অভিপ্রায় অবহেলা করা আমাদের অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে, আমরা প্রযত্ন-পূর্ব্বক বায়ু-প্রবাহের প্রতিরোধ করিয়া থাকি। বাসস্থানে অপ্রতিহত বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চার থাকা নিতান্ত আবশ্যক, ইহা এতদ্দেশীয় লোকেরা কিছুমাত্র বিবেচনা করে না; সুতরাং গৃহ-নির্ম্মাণের সময়ে তাহার উপায় করিয়াও রাখে না।

এতদ্দেশীয় লোকের গৃহ-নির্ম্মাণের প্রণালী পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, বিস্মিত ও দুঃখিত হইতে হয়। গৃহমধ্যে জ্যোতিঃ ও বায়ু-সঞ্চালনের প্রতিষেধ করা যেন ঐ প্রণালীর প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এতদ্দেশীয় পূর্ব্বতন গৃহ-সমুদায়ের এক একটি প্রকোষ্ঠ এক একটি সিন্দুক বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। বাস্তবিক, সিন্দুকের এক পার্শ্বে দুইটি ক্ষুদ্র ছিদ্র এবং অন্য এক পার্শ্বে তদপেক্ষা বৃহত্তর আর একটি চতুষ্কোণ ছিদ্র কর্ত্তন করিলে যেমন হয়, পূর্ব্বকালের প্রকোষ্ঠ-সমুদায় অবিকল সেইরূপ ছিল এবং অদ্যাপি পল্লিগ্রামে অনেক স্থানে সেইরূপ গৃহ প্রস্তুত হইয়া থাকে। তদীয় ভিত্তির ঊর্দ্ধদেশে দুই একটি হস্তপ্রমাণ গবাক্ষ বা বাতায়ন থাকে; তদ্দ্বারা যে প্রমাণ বায়ু গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে, গৃহবাসীরা তাহাই সেবন করিয়া সজীব থাকেন। অনেকানেক তৃণাচ্ছাদিত গৃহে উক্তরূপ গবাক্ষ থাকে না; কেবল এক দিকে অথবা ঊর্দ্ধসংখ্যা দুই দিকে এক বা দুইটি মাত্র ক্ষুদ্র দ্বার বিদ্যমান থাকে। আপাততঃ বোধ হয় উল্লিখিত গৃহ ও প্রকোষ্ঠ সমুদায় প্রস্তুত হইবার সময়ে তাহার মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ বায়ু যাহা রুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা বুঝি তাহা হইতে কোন কালেই নিঃশেষে

নিঃসারিত হয় না। অনেক মহাশয় শীতঋতুতে গৃহের বাতায়ন উদ্ঘাটন করা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যান। তথাকার বিষ-পূরিত দূষিত বায়ু যত্নপূর্ব্বক রুদ্ধ করিয়া রাখেন। ঐরূপ একটি প্রকোষ্ঠমধ্যে বহুসংখ্যক লোক শয়ন করিয়া, শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা তথাকার বায়ু বিষাক্ত করিয়া রাখে। তাহারা সেই বিষাক্ত বায়ুর মধ্যে সমস্ত রজনী রুদ্ধ থাকিয়া যে প্রাতঃকালে সজীব শরীরে গাত্রোত্থান করে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ভাগ্যে আমরা উক্তরূপ গৃহের উক্তরূপ বাতায়নের সার্সী ব্যবহার করিতে শিক্ষা করি নাই, তাহাই তো বাতায়নের ছিদ্র দিয়া অল্প অল্প বায়ু প্রবেশ করিয়া গৃহবাসীদিগের প্রাণরক্ষা করে। সার্সী ব্যবহার করিলে, সমুদায় রন্ধ্র রুদ্ধ হওয়ায়, তাহাদিগকে এক রজনীতেই মৃত্যুগ্রাসে প্রবিষ্ট হইতে হইত।

এই মহানগরের এবং ইহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের অধুনাতন লোকেরা ইংরাজদিগের দৃষ্টান্তানুসারে গৃহের দ্বার ও বাতায়নাদি প্রশস্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের গৃহনির্ম্মাণের সমগ্র প্রণালী বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, গৃহমধ্যে অতি প্রচুর বায়ু-সঞ্চার থাকা যে নিতান্ত আবশ্যক, ইহা তাঁহাদের কদাচ হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে এক একটি প্রকোষ্ঠ-নির্ম্মাণের যেরূপ রীতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এতদ্দেশীয় সমগ্র গৃহই সেইরূপ রীতিক্রমে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্দেশীয় লোক আবাস-গৃহ চক্‌বন্দি করা যেমন ভালবাসেন, অন্য কোন প্রণালী সেরূপ ভালবাসেন না। নূতন গৃহের সূত্রপাত করিবার সময়ে, অগ্রে চকের ঘরের স্থান রাখিয়া, তবে অন্যান্য কার্য্য আরম্ভ করেন। চক্‌বন্দি করার গুণ এই যে, সমগ্র গৃহ চতুর্দ্দিকে প্রকোষ্ঠ-শ্রেণীতে বেষ্টিত থাকিয়া, চতুর্দ্দিকের বায়ু রোধ

করিতে থাকে। বিশেষতঃ রাজধানীর মধ্যে উক্তরূপ চকবন্দি করা নিবাস-গৃহ অশেষ অনর্থের মূল। পল্লীগ্রামে স্থান সুলভ, গৃহ সমুদায় অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, বাস্তবাটীর চতুর্দ্দিকে প্রায়ই উদ্বাস্ত থাকে; অতএব তথায় চকবন্দি হইলেও, গৃহমধ্যে কিয়ৎপ্রমাণ বিশুদ্ধ বায়ু কথঞ্চিৎ সঞ্চারিত হইতে পারে। কলিকাতার বিষয় ইহার নিতান্ত বিপরীত; এখানে ভূমি অতি দুর্লভ। গৃহ অতি সঙ্কীর্ণ। চতুর্দ্দিক চকবন্দি হইলে অঙ্গন অতি অল্প থাকে। এই সমস্ত চকের ঘর দ্বিতল এবং ত্রিতল হইয়া থাকে। বাটীর পার্শ্বে কিছুমাত্র উদ্বাস্ত থাকে না। প্রতিবাসীর বাস-গৃহ এরূপ সন্নিহিত ও সংলগ্ন যে, সেদিকে একটি বাতায়ন রাখিবারও উপায় হয় না। উক্তরূপ এক একটি গৃহ এক একটি কূপ বলিয়া অনায়াসেই উল্লিখিত হইতে পারে। আবার যখন ক্রিয়াকাণ্ডের সময়ে চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত হয়, তখন দারুময় সিন্দুকের সহিত উহার কিছুমাত্র বিশেষ থাকে না। উহার মধ্যে নিশ্বাস-বিষ নির্গত হইতেছে, স্বেদ-বিন্দু সঞ্চিত হইতেছে, রন্ধন-ধূম বিরচিত হইতেছে এবং কত প্রকার গলিত বস্তুর বিষময় বাষ্প সঞ্চরণ করিতেছে। করুণাময় পরমেশ্বর, গৃহমধ্যে অপর্য্যাপ্ত বিশুদ্ধ বায়ুর সতত সঞ্চার থাকা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, যে মঙ্গলগর্ভ মনোহর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, এতদ্দেশীয় লোকে সে নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া, সমুচিত শাস্তি ভোগ করিতেছেন।

আমরা ভ্রান্তিক্রমে যাহা সুখের বিষয় বিবেচনা করি, আমাদিগের বুদ্ধি-দোষে তাহা অত্যন্ত অসুখের কারণ হইয়া উঠে। ক্রিয়াকাণ্ডের সময়ে গৃহস্থের গৃহ যেরূপ অনিষ্টকারী ও বীভৎসজনক হয়, তাহা এই মাত্র উল্লিখিত হইল। রাত্রিকালে নৃত্যগীতাদি হইলে, ততোধিক অহিতকারী হইয়া উঠে। উহা চতুর্দ্দিকে প্রাচীর ও প্রকোষ্ঠ-শ্রেণীতে

পরিবেষ্টিত, উপরিভাগে চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত, এবং অভ্যন্তরে লোক-জনে পরিপূর্ণ। বাস্তবিক, উহা উর্দ্ধাধঃ-সংবলিত দশ দিকে রুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিলেও অসঙ্গত হয় না। বহির্দ্বার উদ্ঘাটিত থাকে বটে, কিন্তু কৌতুকাবিষ্ট অনাহূত লোকের সমাগমে নিতান্ত নিরবকাশ হইয়া যায়। কোন দিক হইতে বায়ু সঞ্চরণের পথ থাকে না। লোকের নিশ্বাসে ও স্বেদনিঃসরণে তথাকার রুদ্ধ বায়ু অতি শীঘ্র দূষিত হয়, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে এমন দুর্গন্ধ হয় যে, অসহ্য হইয়া উঠে। তাল-বৃন্তধারী আজ্ঞাকারী ভৃত্যগণ, সেই সমস্ত দুর্গন্ধময় ঘনীকৃত গরল বারংবার সঞ্চালন করিয়া, নিয়োগকর্ত্তাদিগের ও তদীয় বান্ধবদিগের মুখমণ্ডলে প্রক্ষেপ করিতে থাকে। রাত্রি-জাগরণ ও বিষ-পূরিত বায়ু পরিষেবণ দ্বারা তত্রস্থ সমস্ত লোকের শরীর অবিলম্বে ক্লিষ্ট ও পীড়িত হইয়া পড়ে। যাঁহারা নিশার্দ্ধ সময়ে অথবা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সতেজ-শরীরে ও সরস-বদনে সঙ্গীত-ভূমি আরোহণ করেন, প্রাতঃকালে তাঁহাদিগকে বিবর্ণ-বদন ও ক্লিষ্ট-লোচন অবলোকন করিয়া দুঃখিত হইতে হয়! তদীয় মুখশ্রীতে স্বকীয় অত্যাচারের লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে।

যাঁহারা আমাদিগের আবাস-গৃহ উল্লিখিতরূপ বিধিবিরুদ্ধ করিয়া প্রস্তুত করেন, তাঁহারা দেব-গৃহও তদনুরূপ করিবেন, ইহা সর্ব্বতো-ভাবেই সম্ভব; ফলতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বলিতে হয়, তাঁহারা দেবালয়-নির্ম্মাণ-বিষয়ে শারীরিক স্বাস্থ্যবিধানবিষয়ক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণের একশেষ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষীয় দেব-মন্দিরের মধ্যে অনেক মন্দিরই একদ্বার। যদি বা দুই দ্বার থাকে, তাহার একটি চিরদিন রুদ্ধ; অতএব তাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু-সঞ্চার ও অব্যাহত জ্যোতিঃ-সমাগমের সম্ভাবনা থাকে না। পবন তথায় প্রবেশ করিতে স্থান পান না এবং সূর্য্যও স্বীয় রশ্মি বিকীর্ণ করিতে পথ পান না। সুপ্রশস্ত উন্নত মন্দিরের

মধ্যে দিবা-রাত্রি রাত্রি বিরাজ করে, এবং উহা প্রস্তুত হইবার সময়ে যে বায়ু উহার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহা চিরকারারুদ্ধ দুষ্ট লোকের ন্যায় দূষিত ভাবে চিরকালই তথায় অবস্থিতি করে। কোন কোন প্রধান তীর্থের প্রধান মন্দিরে দিবাভাগেও দীপালোক ব্যতিরেকে দেব-সেবা সম্পন্ন হয় না। ঐ সমস্ত দেবালয়-মধ্যে দীপ-শিখার ধূম উত্থিত হয়, বিল্বদল ও কুসুম-পুঞ্জ গলিত হইয়া দুর্গন্ধ হয়, যাত্রিগণের নিশ্বাস-বায়ু নিঃসৃত হইয়া ব্যাপ্ত হয় এবং যে মন্দিরে শক্তি-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহার অভ্যন্তর ও বাহির পশুকণ্ঠ-বিনির্গত পূতিগন্ধ শোণিতে দূষিত হইয়া অতিমাত্র জঘন্য হইয়া থাকে।

এতদ্দেশীয় লোকের গৃহ-নির্ম্মাণের প্রণালী-বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে, ঐ প্রণালী যে অত্যন্ত অনিষ্টকারী, ইহা অক্লেশেই প্রতীত হইতে পারে। বাসগৃহের সূত্রপাত করিবার সময়ে সর্ব্বাগ্রে অপর্য্যাপ্ত বায়ু-সঞ্চারের সদুপায় নির্দ্ধারণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

রন্ধনের ধূম, গলিত বস্তুর বাষ্প, দুর্গন্ধময় আবর্জ্জনা, লোমকূপ বিনির্গত স্বেদ-বিন্দু ইত্যাদি অনেক বস্তু দ্বারা গৃহের বায়ু নিয়ত দূষিত হইয়া থাকে, ইহা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। যে সমস্ত দুঃখী লোক এক কুটীর বা প্রকোষ্ঠের মধ্যেই অশন, শয়ন, রন্ধনাদি সমস্ত নিত্যক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে, তাহাদিগের গৃহের বায়ু ঐ সমস্ত অনিষ্টকারী পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া, অনবরতই দোষাশ্রিত হয়। যে গৃহে ঐ সমস্ত বস্তু বিদ্যমান থাকে, সতত বায়ুসঞ্চার থাকিলেও তথাকার বায়ু বিশুদ্ধ থাকিতে পারে না। প্রত্যুত নিরন্তর বিষাক্ত হইয়া, গৃহবাসীদিগের শরীরের তেজ ও মনের বীর্য্য বিনাশ করিতে থাকে। অতএব বাসগৃহ সতত পরিষ্কৃত রাখা, গলিত ও দুর্গন্ধ বস্তু দৃষ্টিমাত্র অপসারিত করিয়া

দেওয়া এবং রন্ধনের ধূম গৃহমধ্যে রুদ্ধ না হইয়া, যাহাতে তৎক্ষণাৎ উত্থিত ও বহির্গত হইয়া যায়, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য।

শরীরের স্বেদাদি দ্বারা শয্যার আস্তরণ মলিন হইলে, অত্যন্ত অস্বাস্থ্য-জনক হয়। তাহা হইতে যে এক প্রকার দুঃসহ দুর্গন্ধ নির্গত হইয়া থাকে, তাহা নাসিকারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইবামাত্র রোগাবহ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে। অনেক ব্যক্তির শয্যা এরূপ মলিন ও দুর্গন্ধ, যে উহা কস্মিন্ কালে রজকের হস্ত স্পর্শ করিয়াছিল, এমন বোধ হয় না। উহা প্রতিরাত্রিতে স্বেদস্বরূপ গরল সংযুক্ত হইয়া, তাহাদিগের স্বাস্থ্যসুখ হরণ করে, ইহা তাহারা জানিতে পারে না। অতএব শয্যা পরিষ্কৃত রাখা, বিশেষতঃ তাহার আস্তরণ সতত প্রক্ষালন ও পরিবর্ত্তন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার পরে, উহার আস্তরণাদি তুলিয়া বায়ুসেবিত করা এবং শয়নগৃহের দ্বার ও বাতায়ন উদ্ঘাটন পূর্ব্বক তন্মধ্যে বায়ু-প্রবাহ প্রবাহিত হইতে দেওয়া, সম্যক্ রূপেই বিধেয়। রাত্রিকালের শ্বাস, প্রশ্বাস ও স্বেদ নিঃসরণ দ্বারা গৃহের বায়ু দূষিত হইয়া থাকে, তাহা উল্লিখিত বায়ু-প্রবাহ দ্বারা অপসারিত হইয়া, তৎপরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ বায়ু সমাগত হইতে পারে, এবং শয্যাতে যে সমস্ত স্বেদবিন্দু বিলিপ্ত থাকে, তাহাও ঐ বায়ুপ্রবাহ দ্বারা বিচলিত ও উড্ডীন হইয়া বহির্গত হইতে পারে। যাহাদের শরীর সুপটু নয়, তাহাদিগের শয্যা ও শয়নগৃহ উত্তমরূপ বায়ুসেবিত করা নিতান্ত আবশ্যক ও সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এক ব্যক্তি রাত্রিকালে অতিশয় ঘর্ম্মাক্ত হইত। বিস্তর ঔষধ সেবন করিয়াছিল, কিছুতেই প্রতীকার হয় নাই। কিছু দিন পরে দৃষ্ট হইল, তাহার শয্যার আস্তরণ পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন আস্তরণ পাতিয়া দিলে, ২।৩ দুই

তিন দিবস পর্য্যন্ত কিছুমাত্র ঘর্ম্ম হয় না, এবং নিদ্রারও ব্যাঘাত ঘটে না। ইহা দেখিয়া, তাহার সমুদায় শয়ন বস্ত্র দুই দিবসান্তর প্রক্ষালন করিতে আরম্ভ করিলে, তাহার সে রোগের অশু প্রতীকার হইল এবং সে উত্তরোত্তর বলবান্ হইতে লাগিল।

ভোজনাবশিষ্ট দ্রব্য, বিশেষতঃ সামিষ ব্যঞ্জন কিয়ৎক্ষণ থাকিলেই পচিয়া উঠে; ইহা হইতে যে দুর্গন্ধময় বাস্প উত্থিত হয়, তাহা আমাদিগের পক্ষে বিষবৎ অনিষ্টকারী। তাহার ঘ্রাণ লইলে, শারীর-স্বাস্থ্যসাধনের অতি শীঘ্র ব্যতিক্রম ঘটে। অতএব, উহা গৃহ হইতে অবিলম্বে অপসারিত করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ পীড়িত ব্যক্তির গৃহে ঐ সকল সামগ্রী ক্ষণমাত্র রক্ষা করা বিধেয় নয়।

নিশ্বাস সহকারে শরীর হইতে যে বিষ-তুল্য অনিষ্টকারী পদার্থ নির্গত হয়, রাত্রিকালে বৃক্ষলতাদি হইতেও সেই পদার্থ নিঃসৃত হইয়া, সমীপস্থ সমস্ত বায়ু দূষিত করে। অতএব শয়ন গৃহে সজীব বৃক্ষ ও জলাভিষিক্ত পুষ্প স্থাপিত করা, কোনরূপেই শ্রেয়স্কর নয়; যে গৃহে ঐ সমস্ত বস্তু স্থাপিত হয়, তাহাতে শয়ন করিয়া, অনেক ব্যক্তি এক রজনীর মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

এতদ্দেশীয় অনেক লোক প্রস্তাবিত বিষয়ে আর একটি দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকেন। তাহার তুলনায় উল্লিখিত সমুদায় দোষ, সামান্ত দোষ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা স্বীয় স্বীয় শৌচাগার পার্য্যমাণে পরিষ্কৃত রাখিতে চাহেন না। কোম্পানির লোক তদর্থে তাঁহাদিগকে উত্তেজনা করিলে, তাহাকে উৎকোচ দিয়া বিদায় করিয়া দিবেন এবং আপনারা সপরিবারে দুঃসহ দুর্গন্ধ সহ্য করিয়া থাকিবেন, তথাচ উহার প্রতীকারার্থে যৎকিঞ্চিৎ ব্যয় অঙ্গীকার করিবেন না। মনে করুন, যৎকিঞ্চিৎ উৎকোচ দিয়া ব্যয়ের লাঘব

করিলেন; কিন্তু শৌচাগারজনিত সাঙ্ঘাতিক বিষ নিয়ত শরীরস্থ করিয়া প্রাণ-ধন বিসর্জ্জন দিতেছেন, ইহা ভ্রমেও একবার ভাবেন না। প্রজারা যখন নিজ ভবনে, এবং রাজ-পুরুষেরা যখন রাজপথের প্রান্তবর্ত্তিনী জল-প্রণালীতে উক্তরূপ সাঙ্ঘাতিক বিষ সঞ্চার করিয়া রাখেন, তখন যে কলিকাতা একটি প্রকৃতরূপ প্রধান নরক হইয়া উঠিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি।

গৃহের বায়ু অভ্যন্তরস্থ অনিষ্টকর পদার্থ দ্বারা যেমন দূষিত হয়, সমীপস্থ অস্বাস্থ্য-কর বস্তু দ্বারাও সেইরূপ হইয়া থাকে। কলিকাতায় সর্ব্বস্থানেরই বায়ু দোষাশ্রিত; অতএব তদ্বিষয়ের বৃত্তান্ত আর কি লিখিব! রাজপুরুষেরা অনুকূল হইয়া, উল্লিখিত জল-প্রণালী সমুদায়ের প্রতীকার না করিলে, মহানগর কলিকাতা জিজীবিষু ব্যক্তির বাস-যোগ্য হওয়া সম্ভব নয়। * পল্লিগ্রামে বাস্তুর চতুর্দ্দিকে অনেক উদ্বাস্তু থাকাতে অপর্য্যাপ্ত বিশুদ্ধ বায়ু প্রাপ্ত হইবার উপায় আছে বটে, কিন্তু গৃহের পার্শ্ব-দেশ অত্যন্ত অপরিষ্কৃত করিয়া রাখাতে, সেই বিশুদ্ধ বায়ু অবিশুদ্ধ না হইয়া, গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পায় না। দ্বার-সন্নিহিত আবর্জ্জনা-রাশি, দুর্গন্ধময় ক্ষুদ্র জলাশয়, বাশ বাকসাদির নিবিড় জঙ্গল ইত্যাদি অহিতকারী বস্তু দ্বারা সমুদায় গ্রামস্থ লোকের অতি সুলভ স্বাস্থ্যলাভের বিলক্ষণ ব্যতিক্রম ঘটে। গৃহ-মধ্যে মলমূত্রাদি যত প্রকার আবর্জ্জনা উপস্থিত হয়, সমুদায়ই বহির্দ্বার অথবা গুপ্তদ্বারের সমীপে রাশীকৃত থাকিয়া গৃহ-বাসীদিগের সতেজ শরীর নিস্তেজ ও সুস্থ দেহকে অসুস্থ করিয়া থাকে। উল্লিখিত অপরিষ্কৃত পুষ্করিণী যে সময়ে জলপূর্ণ হয়, সে সময়ে তটস্থ-তৃণাদি

* এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার পরে এ বিষয়ের প্রতীকার-সাধন কার্য্য আরম্ভ হওয়াতে, কলিকাতার পূর্ব্বাবস্থা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

তন্মধ্যে পতিত হইয়া পচিতে আরম্ভ হয়, এবং গ্রীষ্মকালে সেই জল যত শুষ্ক হয়, ততই বিষ-তুল্য বাষ্প-রাশি তাহা হইতে নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে রোগ ও মারী বিকীর্ণ করিতে থাকে। গৃহ-পার্শ্বে যে স্থানে নিবিড় জঙ্গল থাকে, তথাকার বায়ু কোন কালেও পরিশুষ্ক ও পরিশুদ্ধ হয় না। সে স্থানে যখন গমন করা যায়, তখনই এক প্রকার দুরাঘ্রেয় গন্ধ নাসিকা রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইতে থাকে। বিশেষতঃ বর্ষ কালে গলিত পত্রাদি পচিয়া এমন অহিতকারী হয় যে, বোধ হয়, অনেক স্থান কলিকাতা অপেক্ষাও অস্বাস্থ্যজনক হইয়া উঠে।

বাস্তু ও উদ্বাস্তুর এইরূপ অপরিষ্কৃত অবস্থা যে রোগোৎপত্তির প্রধান কারণ, ইহার শত শত প্রমাণ সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বে এডিন্‌বরা নগরের তিন ক্রোশ পশ্চিমে কতকস্থান এ প্রকার অস্বাস্থ্যকর ছিল যে, প্রতিবৎসরই বসন্তকালে তথাকার কৃষকদিগের কম্পজ্বর হইত। তাহারা মনে করিত, পরমেশ্বরের বিড়ম্বনাতেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। পরে যখন তথাকার প্রবাহ-শূন্য পীড়া কারক জলাশয় সকল শোধিত হইল, সুনিয়মানুসারে কৃষি কার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল, গৃহ সমুদায় প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত করিবার রীতি প্রচলিত হইল এবং দ্বার-সন্নিধানে যে সকল দুর্গন্ধময় রাশীকৃত আবর্জ্জনা থাকিত, তাহা দূরীকৃত হইল, তখন পূর্ব্বকার সমুদায় রোগ তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া সে স্থান অতিশয় স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিল। এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করা আবশ্যক বলিয়া, এতদ্দেশীয় লোকের যাবৎ হৃদয়ঙ্গম না হইবে, তাবৎ তাঁহারা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়ম-লঙ্ঘন-জনিত বিবিধ শাস্তি ভোগ করিয়া, অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে থাকিবেন।

———

গ্রহণ।

সূর্য্য নিজে তেজোময়, চন্দ্র ও পৃথিবী নিজে তেজোময় নয়, ইহা চারুপাঠের দ্বিতীয়ভাগে লিখিত হইয়াছে। আর পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে ও চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে, ঐ পুস্তকে এ বিষয়েরও বিবরণ করা গিয়াছে। যে যে ছাত্রের তাহা স্মরণ আছে, তাঁহারা সহজেই গ্রহণের বিষয় বুঝিতে পারিবেন।

ঐরূপ পরিভ্রমণ করিতে করিতে, পৃথিবী যখন চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যস্থলে আইসে, তখন পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হয়, এই নিমিত্তই চন্দ্রকে অন্ধকারে আবৃত দেখায়। ইহাকে চন্দ্রগ্রহণ কহে। পশ্চাল্লিখিত চিত্রময় প্রতিরূপ দেখিলেই এ বিষয় অক্লেশে বুঝিতে পারা যাইবে। স, সূর্য্য; পৃ, পৃথিবী; চ, চন্দ্র; ক, খ, ছ, পৃথিবীর ছায়া; চন্দ্র এই ছায়াতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ ছায়া প্রবেশকেই চন্দ্রের গ্রহণ বলে। পৃথিবী ও চন্দ্রের গতির যেরূপ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তদনুসারে কোন কোন পূর্ণিমাতে পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যস্থলে আইসে। এই নিমিত্ত কেবল সেই সেই পূর্ণিমাতে চন্দ্রগ্রহণ হইয়া থাকে। সকল পূর্ণিমাতে পৃথিবী চন্দ্র সূর্য্যের ঐরূপ মধ্যবর্ত্তী হয় না; সুতরাং পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়ে না; এই নিমিত্ত সকল পূর্ণিমাতে চন্দ্রগ্রহণ হয় না।

চন্দ্র যখন ছায়ার মধ্যস্থল দিয়া গমন করে, তখন চন্দ্রের সমুদায় অংশ ছায়াতে আবৃত হয়। ইহাকেই সর্ব্বগ্রাস বলে।

যখন চন্দ্র ঐ ছায়ার এক পার্শ্ব দিয়া গমন করে, তখন চন্দ্রের সমুদায় অংশ ছায়াতে আবৃত না হইয়া, কিয়দংশ মাত্র আবৃত থাকে।

ইহাকেই আংশিক গ্রাস বলে। কখন দ্বিপাদ গ্রাস, কখন ত্রিপাদ গ্রাস, কখন বা পাদমাত্র গ্রাস হয়।

ছায়াতে আবৃত হওয়াতে, যেমন চন্দ্রের গ্রহণ হয়, সূর্য্যের গ্রহণ সেরূপ নয়। যখন চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যস্থলে আইসে, তখন চন্দ্রের দ্বারা সূর্য্য ঢাকা পড়ে। ইহাকেই সূর্য্যগ্রহণ কহে। পশ্চাৎ এ বিষয়ের যে চিত্রময় প্রতিরূপ প্রকটিত হইল, তাহা দেখিলে সূর্য্যগ্রহণের বিষয় অনায়াসে বোধগম্য হইবে। স, সূর্য্য; চ, চন্দ্র; ক, খ, চন্দ্রের ছায়া; পৃ, পৃথিবী। চন্দ্রের দ্বারা সূর্য্যের এইরূপ আচ্ছন্ন হওয়াকেই সূর্য্যগ্রহণ বলে। যেমন হাত আড়াল দিলে সম্মুখস্থ প্রদীপ দেখা যায় না, সেইরূপ চন্দ্র সূর্য্যের সম্মুখে আইলে, সূর্য্যের যে অংশ চন্দ্রের অন্তরালে অবস্থিত হয়, সেই অংশ দেখা যায় না।

প্রথমেই লিখিত হইয়াছে, সূর্য্য যেমন নিজে তেজোময়, চন্দ্র সেরূপ নয়। সূর্য্যের রশ্মি পাইয়া চন্দ্র প্রকাশ পায়। সূর্য্যগ্রহণের সময় চন্দ্রের যে ভাগ সূর্য্যের দিকে থাকে, সে ভাগ সূর্য্যরশ্মি পাইয়া প্রকাশিত হয়। আর যে ভাগ আমাদের দিকে থাকে, সে ভাগ ঐ রশ্মি না পাওয়াতে অপ্রকাশিত থাকে। এই নিমিত্ত সে সময়ে আমরা চন্দ্রও দেখিতে পাই না।

পৃথিবী ও চন্দ্রের গতির যেরূপ নিয়ম নিরূপিত আছে, তদনুসারে কোন কোন অমাবস্যাতে চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যস্থলে আইসে;
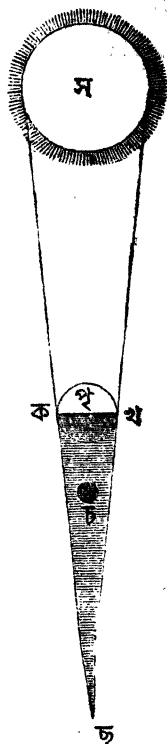
এই নিমিত্ত কেবল সেই অমাবস্যাতেই সূর্য্যগ্রহণ হইয়া থাকে। সকল অমাবস্যাতেই চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্য্যের সেইরূপ মধ্যবর্ত্তী হয় না; সুতরাং সূর্য্য, চন্দ্রের দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না। এই নিমিত্ত সকল অমাবস্যাতে সূর্য্যগ্রহণ ঘটে না।

যে যে অমাবস্যাতে চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য্যের ঠিক মধ্যবর্ত্তী হয়, সেই সেই অমাবস্যাতে চন্দ্রের দ্বারা সূর্য্যের সমুদায় অংশ আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ সমুদায় আচ্ছন্ন হওয়াকেই সর্ব্বগ্রাস বলে।

কখন কখন চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য্যের ঠিক মধ্যবর্ত্তী হইলেও সর্ব্বগ্রাস হয় না। যেমন চক্ষুর অধিক নিকটে একটা পয়সা ধরিলে কোন গুম্বজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, ঐ পয়সা দ্বারা গুম্বজের সমুদায় অংশ ঢাকা পড়ে, সেইরূপ যখন চন্দ্র, পৃথিবীর ও সূর্য্যের ঠিক মধ্যবর্ত্তী হইবার সময়ে, পৃথিবীর অধিক নিকটে আইসে, তখন সূর্য্যের সমুদায় অংশ চন্দ্রের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়। যেমন চক্ষু হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটা পয়সা ধরিয়া গুম্বজের মধ্যস্থলে দৃষ্টিপাত করিলে, ঐ গুম্বজের কিয়দংশ মাত্র ঐ পয়সাতে ঢাকা পড়ে এবং ঐ অংশের চারি পার্শ্ব দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে; সেইরূপ যখন চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবীর ঠিক মধ্যবর্ত্তী হইবার সময়ে, পৃথিবী হইতে কিছু অন্তরে থাকে, তখন সূর্য্যের কিয়দংশ মাত্র চন্দ্র দ্বারা আবৃত হয়, এবং ঐ অংশের চারিপার্শ্ব দৃষ্টি গোচর থাকিয়া জ্যোতির্ম্ময় বলয়ের ন্যায় দেখা যায়। এই পরম সুদৃশ্য সূর্য্য-গ্রহণকে সূর্য্যের মাধ্য-গ্রাস বলিয়া উল্লেখ করা যায়। কিন্তু এরূপ গ্রহণ
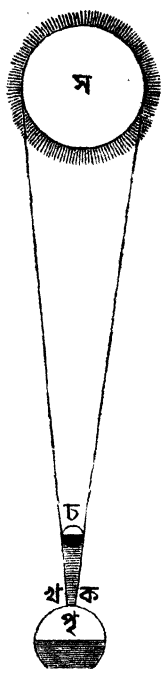
সচরাচর ঘটে না। ১৮৩৬ আঠার শ ছত্রিশ খৃষ্টাব্দে ১৫ পনরই মে ব্রিটিশ দ্বীপে সূর্য্যের যেরূপ মাধ্যগ্রাস দৃষ্ট হইয়াছিল, পশ্চাৎ তাহার প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল।

সম্প্রতি ১৭৭৯ সতরশ উনআশি শকের ৩ তেসরা চৈত্রও ইংলণ্ডের দক্ষিণ ভাগে সূর্য্য-মণ্ডলের ঐরূপ মাধ্য-গ্রাস দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। পৃথিবীর সকল স্থলে সূর্য্য অথবা চন্দ্রের এককালীন উদয় হয় না; গ্রহণের সময়ে যে যে স্থানে উদয় হয়, সেই সেই স্থানের লোকেরা গ্রহণ দেখিতে পায়, অন্য অন্য স্থানের লোকেরা দেখিতে পায় না।
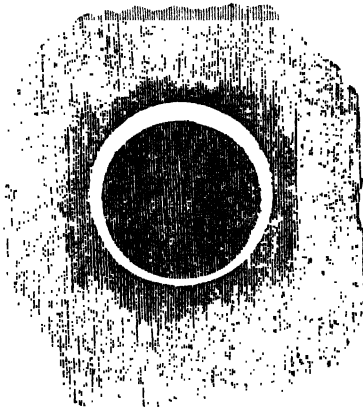
কিন্তু সূর্য্য-গ্রহণের সময়ে যে যে স্থানে সূর্য্যের উদয় হয়, তাহারও সকল স্থানে গ্রহণ দৃষ্ট হয় না। তাহার কারণ পশ্চাৎ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

স্থ, সূর্য্য; চ, চন্দ্র; অ, ক, খ, হ, পৃথিবীর কিয়দংশ, গ, ঘ, চন্দ্রের ছায়া। ঐ গ, ঘ, চিহ্নিত স্থানের লোকেরা সূর্য্যের সর্ব্ব-গ্রাস দেখিতে

পাইয়াছে; গ, ক ও ঘ, খ, স্থানের লোকেরা সূর্য্যের কিয়দংশমাত্র আচ্ছন্ন দেখিতেছে। কিন্তু যে যে স্থানে এক একটি চক্ষুর প্রতিরূপ আলিখিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানের লোকেরা সূর্য্যের সমুদয় অংশই অনাচ্ছন্ন দেখিতেছে। সুতরাং তাহারা গ্রহণ দেখিতে পাইতেছে না। ক, খ, চিহ্নিত স্থানের লোকেরা গ্রহণ দেখিতে পায় ও ক, অ ও খ, হ, স্থানের লোকেরা সেই সময়ে গ্রহণ না দেখিয়া, তেজোময় সূর্য্য দর্শন করিতেছে। ইহা আপাততঃ আশ্চর্য্য বিষয় বোধ হয় বটে, কিন্তু ইহার যে কারণ নির্দ্দেশ করা গেল, তাহা জানিলে, আর আশ্চর্য্য বোধ হয় না।
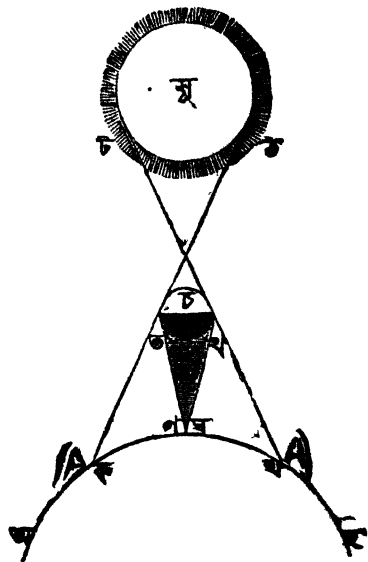
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

স্বপ্ন-দর্শন,—ন্যায়-বিষয়ক।

আমি বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, কনখল প্রভৃতি পশ্চিমোত্তর-প্রদেশীয় বহুতর স্থান পর্য্যটন করিয়া, শীত-ঋতুর উপক্রমেই বিন্ধ্যাচলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এ প্রদেশে শীতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। প্রাতঃকালে চতুর্দ্দিক্ মেঘাবৃতবৎ ঘনতর কুজ্ঝটিকাতে আচ্ছন্ন থাকে; অতি শীতল পশ্চিম বায়ু প্রবাহিত হইয়া, কলেবর কম্পমান করে ও বৃক্ষপত্রের শিশির-বিন্দু-সমুদায় ঝরঝর শব্দে পতিত হইয়া, তলস্থ ভূমিকে অল্প অল্প আর্দ্র করিতে থাকে। সূর্য্য-বিম্ব সর্ব্বদা ম্লান-মূর্ত্তি; গগন-মণ্ডলে বহু দূর উত্থিত হইলেও নীহার-প্রভাবে চন্দ্র-বিম্বের ন্যায় অতি মৃদু ভাবে প্রকাশ পায়, এবং মধ্যাহ্ন কালেও তদীয় কিরণ-জাল পরম-সুখ-সেব্য বলিয়া অনুভূত হয়। সায়ংকালে ও রজনীতে গৃহের বহির্ভূত হওয়া, অত্যন্ত দুষ্কর; তৎকালে দ্বাররোধ করিয়া অগ্নিসেবন করাই পরম প্রীতিকর বোধ হয়। গত দিবস যামিনী-যোগে যোগমায়ার মন্দিরের সমীপবর্ত্তী গৃহে কতকগুলি উদাসীনের সহিত একত্র উপবেশন-পূর্ব্বক অগ্নি-সেবন ও পরস্পর কথোপকথনে মহাসুখে কালযাপন করিতেছিলাম। আমার বামপার্শ্বে এক বিমর্ষ যুক্ত মৃদু-ভাষী তরুণ-বয়স্ক সন্ন্যাসী উপবিষ্ট ছিলেন; কথা-প্রসঙ্গে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসিয়া অবগত হইলাম, তিনি বাঙ্গালাদেশীয় এক ব্রাহ্মণের পুত্র। তাঁহার পিতার পরলোক-যাত্রার পরে তাঁহার পিতৃব্য-পুত্রেরা প্রতারণা করিয়া,

তাঁহাকে পৈতৃক বিষয়ে বঞ্চিত করিয়াছে। তিনি অতি নির্ব্বিরোধ মনুষ্য; বিবাদ-বিসংবাদে কোন ক্রমে প্রবৃত্ত হইতে চাহেন না; তথাপি আত্মীয়-স্বজনের পরামর্শক্রমে রাজদ্বারেও ইহার প্রতীকার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রতিপক্ষের সহায়-সম্পত্তি-বল অধিক ছিল, একারণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; অবশেষে মনোদুঃখে সংসার-বিরক্ত হইয়া, সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন।

তাঁহার বাক্যাবসান না হইতেই আমার সম্মুখবর্ত্তী আর এক সুশীল শান্ত-স্বভাব ধর্ম্মপরায়ণ উদাসীন, "হা নারায়ণ!" বলিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কহিলেন,—"ভাই! তোমার দারুণ দুঃখের কথা শুনিয়া, আমি মহা-খেদান্বিত হইলাম; এক্ষণে আমার দুর্দ্দশার বিষয় কিছু শ্রবণ কর। আমি কোন রাজ-সংক্রান্ত সম্ভ্রান্ত পদে নিযুক্ত ছিলাম এবং নির্ব্বিঘ্নে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া, যশোভাজন হইয়াছিলাম; ইতিমধ্যে আমার উপরিতন অধ্যক্ষের মৃত্যু ঘটনা হইলে, অন্য এক ব্যক্তি তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন। প্রথমাবধি তাঁহার আচরণ দেখিয়া বোধ হইল, রাজ-কোষের সর্ব্বস্ব হরণ-সঙ্কল্প করিয়াই তিনি এ কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আমাকে তাঁহার অনুগামী করিবার নিমিত্তে বিস্তর কৌশল করিলেন; কিন্তু কোন ক্রমেই মানস পূর্ণ করিতে না পারিয়া, অবশেষে আমাকে পদ-চ্যুত করিবার নিমিত্তে চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং ক্রমাগত তিন বৎসর শঠতা, মিথ্যাকথন ও নানাপ্রকার প্রতারণার অনুষ্ঠান দ্বারা চরিতার্থ হইয়া, আপনার কোন প্রিয়-পাত্রকে আমার পদে নিযুক্ত করিলেন। প্রধান প্রধান রাজ-পুরুষেরা অনেকেই তাঁহার দুষ্ট ব্যবহার ও আমার নির্দ্দোষ চরিত্র জ্ঞাত ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা কেহই মনোযোগ করিলেন না। এ সকল বিষয়ের যেরূপ চরম ফলাফল দেখিয়া আসিতেছি,

তাহাতে আমার নিশ্চয় বোধ হইল, ইহার প্রতীকার করা এক প্রকার অসাধ্য। অতএব নিতান্ত অনুপায় ভাবিয়া সংসারাশ্রমে ধিক্কার দিয়া, এই পথের পথিক হইয়াছি।

এই সমুদায় শোচনীয় ব্যাপার শ্রবণ করিয়া, আমি বিষাদ-সমুদ্রে মগ্ন হইলাম, এবং দয়া, ক্ষোভ ও ক্রোধ পর্য্যায়ক্রমে আমার অন্তঃকরণকে ব্যাকুলিত করিতে লাগিল। সাংসারিক লোকের এই সকল অন্যায়াচরণ ভাবিতে ভাবিতে, সে রজনীতে আমার সুন্দররূপ নিদ্রা হইল না; কারণ চিন্তাকুল-চিত্তে সুচারু সুষুপ্তি-সমাগম সম্ভব নয়। পরে রাত্রিশেষে কিঞ্চিৎ নিদ্রাকর্ষণ হইতেই আমি কি অপূর্ব্ব ব্যাপারসকলই দর্শন করিলাম! সে সমুদায় আমার এরূপ হৃদয়ঙ্গম হইয়া রহিয়াছে যে, স্বপ্ন কি বাস্তবিক, সহসা অনুভব করা যায় না। আমি জন-সমাজের যে প্রকার বিপর্য্যয় দেখিয়াছি, তাহা সবিশেষ বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তবে তাহার স্থূল তাৎপর্য্য ও স্বদেশসম্বন্ধীয় যৎকিঞ্চিৎ যাহা দৃষ্টি করিয়াছি, তাহাই যথার্থবৎ বর্ণন করি। কিন্তু স্বপ্নের সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য না থাকিলেও না থাকিতে পারে।

আমার বোধ হইল, যেন কোন তিমিরাবৃত রজনীতে ভ্রমণ করিতে করিতে, অকস্মাৎ আকাশ-মণ্ডলের পশ্চিমাংশ দাব-দাহ তুল্য অসামান্য জ্যোতিঃপূর্ণ দেখিয়া, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম। সেই আশ্চর্য্য তেজোরাশি দ্রুতবেগে অধোদিকে আগমন করিতে লাগিল। অনুভব হইল, যেন সূর্য্য-মণ্ডল কোন অনির্দ্দেশ্য অনির্ব্বচনীয় কারণবশতঃ স্থান-ভ্রষ্ট হইয়া, পতিত হইতেছে। কিঞ্চিৎ সমীপস্থ হইলে, তাহার অভ্যন্তরে এক পুরুষচ্ছায়া প্রত্যক্ষবৎ আভাসমান হইল। তাহার কিছুকাল পরে, স্পষ্ট দেখিলাম,—শুভ্রকান্তি, শুভ্র-মাল্যাদি-বিশিষ্ট শুভ্রালঙ্কার-ভূষিত কোন তেজঃপুঞ্জ পুরুষ এক মণিময়

দণ্ডহস্তে * পৃথিবীতে অবতরণ করিতেছেন। সেই দণ্ডের শিরোভাগে 'ন্যায়' এই অক্ষরদ্বয় অঙ্কিত ছিল, এবং দিবসে যেমন বিদ্যুৎ প্রকাশ পায়, সেই তেজোমণ্ডল-মধ্যে ন্যায়-দণ্ডের প্রভা সেইরূপ প্রকাশ পাইতে লাগিল। ফলতঃ সেই পুরুষের সমস্ত লক্ষণ দৃষ্টি করিয়া, আমার নিশ্চয় প্রতীত হইল, ইনি ধর্ম্ম-পুরুষ; ন্যায়দণ্ড হস্তে করিয়া ভূ-লোক শাসনার্থ আগমন করিতেছেন। অনেকেই তাঁহার প্রখর প্রভা সহ্য করিতে না পারিয়া, ভীত-চিত্ত হইল; আর যিনি যিনি সহিষ্ণুতা-প্রভাবে তাঁহাকে সুন্দর রূপ নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন. তাঁহার নিকটে তিনি পরম রমণীয় রূপে প্রকাশিত হইলেন। এক কালেই তিনি ভয়ঙ্কর ভ্রূভঙ্গি দ্বারা কাহাকেও ভয়ে কম্পমান করিলেন, কাহাকেও বা প্রসন্ন-বদনে সুমধুর-হাস্য-প্রকাশ দ্বারা পরমানন্দ-নীরে নিমগ্ন করিতে লাগিলেন। যখন তিনি ভূ-মণ্ডলের সমীপবর্ত্তী হইয়া, মনুষ্যের দৃষ্টিপথের অন্তর্গত হইলেন; তখন চতুর্দ্দিকে কতকগুলি মেঘাবলি বিস্তার দ্বারা আপনার মহামহিমান্বিত জ্যোতিঃ-পূর্ণ মূর্ত্তি আবৃত করিয়া, তৎপরিবেশ-স্বরূপ আলোক-ঘটা নানা বর্ণভূষিত ও সর্ব্বলোকের সুখ দৃশ্য করিয়া, বিকীর্ণ করিলেন। ইতিমধ্যে যাবতীয় লোক বিস্ময়াপন্ন ও শঙ্কাকুল হইয়া, এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সমাগত হইল। বোধ হইল, যেন সমুদায় মনুষ্য একত্র উপস্থিত হইয়াছে। অকস্মাৎ "সত্যের জয়! সত্যের জয়!" বলিয়া ঘন ঘন আকাশ-বাণী হইতে লাগিল। পরে সেই মহামহিমান্বিত পুরুষ মেঘাভ্যন্তর হইতে কহিতে লাগিলেন.—"মানবগণ! রাজ্যের অবিচার-নিবারণার্থে আমার আগমন হইয়াছে, তোমরা আপন আপন প্রাপ্য বিষয় প্রাপ্ত্যর্থে প্রস্তুত হও!" এই আকস্মিক দৈবধ্বনি শ্রবণ করিয়া,

* পুরাণে ধর্ম্মের এইরূপ মূর্ত্তি বর্ণিত আছে।

জন-সমাজ ভয়, আশা, হর্ষ ও খেদে যে প্রকার বিচলিত হইল, তাহা বর্ণন করা যায় না।

তদনন্তর ধর্ম্ম অনুমতি করিলেন,—"প্রথমতঃ বিষয়াধিকারের বিষয় সমাধা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যে ধনে যাহার স্বত্ব আছে, তিনি তাহা এই দণ্ডেই প্রাপ্ত হইবেন। অতএব যাহার যত লেখ্যপত্র আছে, সমস্ত উপস্থিত কর।" ইহা শুনিয়া যাবতীয় লোক স্ব স্ব স্বত্বাধিকার সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত বিবিধ-প্রকার লেখ্য-পত্র, আহরণ করিলেন। কি আশ্চর্য্য! তাহাদের উপর ন্যায়দণ্ডের জ্যোতিঃ পতিত হইবামাত্র, তাহাদের যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশিত হইল। সেই দণ্ডের এ প্রকার আশ্চর্য্য গুণ যে, তদীয় কিরণ-স্পর্শমাত্র যাবতীয় কৃত্রিম পত্র দগ্ধ হইয়া গেল। দহ্যমান পত্রের প্রজ্বলিত অগ্নি, সমুদায় লাক্ষাদ্রব ও অনর্গল ধূমোদ্গম দ্বারা সে স্থান অতি ভয়ানক ও পরম বিস্ময়কর হইয়া উঠিল। কোন কোন পত্রের দুই চারি পঙ্‌ক্তি ও কোন কোন পত্রের কেবল কতিপয় প্রক্ষিপ্ত অক্ষর নষ্ট হইয়া, তাহার অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া গেল। কিন্তু শত শত মুদ্রার ষ্ট্যাম্প-পত্র সকল দাবানল-দগ্ধ মহারণ্যের ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া, পর্ব্বতাকার হইল। সেই লক্ষ লক্ষ মণিময় দণ্ডের জ্যোতিঃ কত কত পরম গুহ্য স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া, অলক্ষিত অপহৃত ও সংগোপিত লেখ্য-পত্র প্রকাশ করিয়া ফেলিল। ইতিমধ্যে আর এক অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলাম। প্রধান প্রধান বিচারাগারের সহস্র সহস্র অনুজ্ঞা-পত্র দগ্ধ হইল, ইন্‌সালবেণ্ট্‌ কোর্টের প্রায় সমস্ত নিষ্কৃতি-পত্র ভস্মীভূত হইয়া গেল, ও যে সকল সম্ভ্রমশালী ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, নির্ম্মুক্ত পুরুষের ন্যায় বিহার ও ব্যবহার করিতেছিলেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বন্দী হইয়া, দণ্ডায়মান হইলেন। ইতিমধ্যে উৎকোচ,

অপহরণ, প্রতারণা ও বলপ্রয়োগ দ্বারা যাবতীয় ধন উপার্জ্জিত হইয়াছিল, সমুদায় পর্ব্বত-প্রমাণ রাশীকৃত হইয়া, মেঘমণ্ডল স্পর্শ করিল, এবং তখন ধর্ম্মপুরুষ ঘোষণা করিয়া দিলেন,—"এই ধনরাশি হইতে যাহার যত ন্যায্য ধন আছে, গ্রহণ কর।"

উহাতে লোক-সমাজের কি বিষম বিপর্য্যয় ঘটিয়া উঠিল! সহস্র সহস্র ব্যক্তি অপূর্ব্ব-বেশভূষণ ধারণপূর্ব্বক পরম-রমণীয় রথারোহণ করিয়া, মহাবেগে গমন করিতেছিলেন, তৎক্ষণাৎ অবতরণ পুরঃসর পাত্র হইতে সমস্ত বস্ত্রাভরণ উন্মোচন করিয়া, এক সামান্য বসন পরিধান-পূর্ব্বক পদব্রজে চলিলেন। কোন স্থানে দেখিলাম, লক্ষপতি বা কোটিপতি ধনাঢ্য ব্যক্তি পরমশোভাকর অট্টালিকায় বহুমূল্য অত্যুত্তম আসনে উপবিষ্ট হইয়া, বন্ধু-বান্ধবদিগের সহিত আমোদ-প্রমোদে পরমসুখে কাল-হরণ করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে একজন সামান্য গৃহস্থ অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে আসনচ্যুত করিয়া দিল, এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে নির্গত হইয়া, অতি পুরাতন বৃক্ষ-মূল-বিদ্ধ ভগ্ন গৃহে গিয়া বাস করিলেন। কুত্রচ দৃষ্টি করিলাম, যে সকল ধনাসক্ত, মহামান্য মনুষ্য সমধিক ধনাগম করিয়া, অতি উদার-ভাবে ব্যয় বাসন করিয়া আসিতেছিলেন, ও অতিশয় আড়ম্বর-সহকারে নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিয়া, বিপুল কীর্ত্তি-লাভ করিতেছিলেন, সহসা তাঁহাদের সামান্যরূপ উদরান্ন আহরণ করাও কঠিন হইল, এবং কতকগুলি নিরন্ন নির্ব্বিষয় ব্যক্তি আসিয়া, তাঁহাদের সমুদায় সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইল। তদ্ভিন্ন ধনাধিকার-বিষয়ে যে সকল অল্প অল্প পরিবর্ত্তন হইল, তাহার বিবরণ করিয়া শেষ করা যায় না। জাগরিত হইয়া যাহা দেখিতেছি, তখন তাহার বিস্তর অন্যথা-ভাব দৃষ্টি করিয়াছিলাম।

এবম্ভূত অদ্ভুত কাণ্ড সমুদায় অবলোকন করিয়া, বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইতেছিলাম, ইতিমধ্যে অপর এক পরম কৌতূহল-জনক অত্যাশ্চর্য্য মহোপকারী ব্যাপার উপস্থিত হইল। ধর্ম্মপুরুষ মেঘান্তরে অবস্থান পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত তাবৎ কার্য্য সমাধা করিয়া, আদেশ করিলেন,—"অবনী-মণ্ডলে কেহ অন্যায় মানসম্ভ্রম-লাভে সমর্থ হইবে না, অদ্যাবধি সকলেই নিজ নিজ গুণানুসারে পদ প্রাপ্ত হইবেন।" এই অতুল হিতকর অনুমতি শ্রবণ করিয়া, লোক-সকল যৎপরোনাস্তি উৎকণ্ঠা-পর্য্যাকুল হইল। রূপবান্, বলবান্ ও ধনবান্ মনুষ্যেরা সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মদেবের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া, দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার ন্যায়-দণ্ড-জ্যোতিঃ সহ্য করিতে না পারিয়া, অবিলম্বে পরাঙ্মুখ হইলেন। তিনি কেবল তাঁহার সর্ব্বগুণময় ন্যায়-দণ্ডের কিরণ বিকীর্ণ করিয়া, সকলকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। উহাতে যাহাদের বিশিষ্টরূপ ধর্ম্ম, বিদ্যা বা বিষয়-বুদ্ধি আছে, তদ্ভিন্ন আর তাবতেই দণ্ড-জ্যোতিঃ দর্শনমাত্রে বিমুখ ও শঙ্কাতুর হইয়া রহিলেন। সেই সকল মহাত্মারা পর্য্যায়ক্রমে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। পরম হিতৈষী পুণ্যবান্ লোকেরা প্রথম শ্রেণীতে, বিদ্যাবান্ লোকেরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ও বিষয়-নিপুণব্যক্তি সকল তৃতীয় শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইলেন। প্রথম শ্রেণীর শোভা দেখিয়া মন মোহিত হইল। তাঁহাদের কি প্রফুল্ল বদন, সকরুণ নয়ন ও সুমধুর বচন! কি সৌজন্য, কি কারুণ্য-স্বভাব! তাঁহাদিগের পরম পবিত্র জ্যোতিঃ-পূর্ণ মুখশ্রী অবলোকন করিলে, অন্তঃকরণ প্রেমামৃত রসে আর্দ্র হইতে থাকে। কতকগুলি হীন-জাতীয় এবং অজ্ঞাত-কুলশীল মনুষ্যকেও এই শ্রেণী-ভুক্ত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। জাগ্রৎকালে যাহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া, আপনাকে অশুচি বোধ করিয়াছিলাম, তখন দেখিলাম, তাঁহারা কত শত সদ্বংশজ ভদ্র-সন্তানের অপেক্ষা

উৎকৃষ্ট পদ লাভ করিয়াছেন, এবং যাঁহাদিগকে পরম তপস্বী ঋষিতুল্য বোধ ছিল, তাঁহারা এই শ্রেণীতে যৎকিঞ্চিৎ স্থানও প্রাপ্ত হইলেন না কত কত দীর্ঘপুণ্ড্রধারী দাম্ভিক ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ের শত শত আত্মাভিমানী বহুভাষী ছাত্র, এই শ্রেণীতে ভুক্ত হইবার নিমিত্তে বিস্তর বাগ্‌বিতণ্ডা করিলেন। অবশেষে যখন দর্পহারী ধর্ম্মপুরুষ তাঁহাদের মুখ-মণ্ডলোপরি ন্যায়-দণ্ড চালনা করিয়া, তদীয় প্রচণ্ড জ্যোতিঃ বিস্তীর্ণ করিলেন, তখন তাঁহারা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া লজ্জায় অধোমুখ হইয়া, তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সংস্থাপনের সময় বিষম বিবাদ উপস্থিত হইল। যত লোক সে শ্রেণীর অধিকারী, সকলেই নিজ নিজ গুণাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদ প্রাপ্তির নিমিত্তে সাতিশয় ব্যগ্র হইলেন। তাঁহাদিগের এইরূপ অবিহিত অনুচিত জিগীষা দেখিয়া, ধর্ম্মপুরুষ দণ্ডহস্তে স্বয়ং অগ্রসর হইয়া, সকলের স্ব স্ব গুণোচিত সম্মান প্রদান করিলেন। সর্ব্বোত্তম ধী-শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি-সমুদায়কে সর্ব্বাগ্রে স্থাপিত করিলেন। যাহাদের তাদৃশ স্বকীয় শক্তি নাই, যাহারা কেবল পরিচিত গ্রন্থ পাঠ দ্বারা বিদ্যা-বিষয়ে পারদর্শী হইয়াছে, তাহাদিগকে তৎপরে স্থাপিত করিলেন। যাহাদিগের অনেকানেক গ্রন্থ পাঠ হইয়াছে, কিন্তু তাদৃশ বিচারশক্তি নাই, তাহারা সর্ব্বশেষে থাকিল। এইরূপে এক্ষণকার প্রত্যেক বিদ্যাবান্‌ ব্যক্তি ইহার কোন না কোন স্থানে নিবিষ্ট হইলেন। ফলতঃ কি বিপর্য্যয়ই দেখিলাম। যাঁহাদের বিদ্যাবিষয়ে বিলক্ষণ খ্যাতি আছে, তন্মধ্যেও অনেকানেক ব্যক্তি অধম স্থানে সংস্থাপিত হইলেন। কতকগুলি বাঙ্গালা-গ্রন্থকর্ত্তা এই শ্রেণী-ভুক্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; কিন্তু আক্ষেপের কথা কি কহিব, ধর্ম্মপুরুষ তাঁহাদিগকে নিতান্ত অনধিকারী বিবেচনা করিয়া, তথা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। সে

শ্রেণীতে কোন স্থানে তাঁহাদের স্থান হইল না। তাঁহাদের এই দারুণ দুরবস্থা দর্শন করিয়া, আমার অন্তঃকরণ দুঃসহ দুঃখ-তাপে তাপিত হইতে লাগিল। ভাবিলাম, এই সকল অবোধ মনুষ্য যে বিষয়ে যশঃ-সৌরভ লাভের বাসনা করে, অধিকারী না হইয়া, তাহাতে কেন প্রবৃত্ত হয়? তবে প্রবোধের বিষয় এই যে, তিনি তাহাদিগকে শ্রেণী-বহির্ভূত করিয়া কহিলেন,—"তোমরা প্রতিপত্তি-লাভ ও স্বদেশোপকারের উৎকৃষ্ট পথ অবলম্বন করিয়াছ। স্বদেশীয় ভাষার অনুশীলন ব্যতিরেকে কখন কোন দেশে জ্ঞানের প্রচার ও প্রাদুর্ভাব হইতে পারে না। তোমরা কিছুকাল পঠদ্দশায় থাক, পরে মনোরথ পূর্ণ হইলেও হইতে পারে। তোমরা যে সকল প্রস্তাব লিখিয়া থাক, তাহার পূর্ব্বাপর ঐক্য থাকে না, ভাবের প্রগাঢ়তা থাকে না এবং রচনাও পরিপাটি-শুদ্ধ হয় না। বিশেষতঃ যিনি যে বিষয় রচনা করেন, তিনি তাহা নিয়মিতরূপে শিক্ষা ও তদ্বিষয়ে সবিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়াই তাহাতে প্রবৃত্ত হন। আর অনেকে যৎকুৎসিত অনুপ্রাসের অনুরোধে তাৎপর্য্যের ব্যাঘাত করেন। ইত্যাকার সমস্ত দোষ সংশোধনপূর্ব্বক অভীষ্ট বিষয়ে পারদর্শী হইতে পারিলে, অবশ্য কৃতকার্য্য হইবে।" যাহারা ভাষান্তরে সামান্যরূপ কথোপকথন শিক্ষা করিয়া, বিদ্যাভিমান প্রকাশ করে, যাহাদের কোন বিজ্ঞান-শাস্ত্রে কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি হয় নাই, তাহাদের অপমান দেখিয়া, হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তাহারা ধর্ম্মপুরুষের বিস্তর সাধ্য-সাধনা করিয়াও তথায় যৎকিঞ্চিৎ স্থান প্রাপ্ত হইল না। আর কতকগুলি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের দুরবস্থার বিষয় কি বলিব! তাঁহারা নিরুপবীত হীনজাতীয় শত শত ব্যক্তিকে আপনার অপেক্ষা উচ্চ পদাভিষিক্ত দেখিয়া, অতিশয়, সন্তপ্ত হইলেন। আহা! কত কত গুরুদেব ঐ শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হইয়া

লজ্জায় অধোমুখ হইলেন, এবং তাঁহাদের শিষ্যেরা তাঁহার উৎকৃষ্ট স্থানে স্থিতি করিয়া, তাঁহাদের দারুণ দুর্দ্দশা দর্শন করিতে লাগিলেন।

এই শ্রেণীর লোক-সংস্থাপন সমাপ্ত হইলে, ধর্ম্মপুরুষ বিষয়ীদিগকে আহ্বান করিলেন। তাহা শুনিয়া, চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী প্রতাপান্বিত মানগর্ব্বিত শত শত ব্যক্তি সবিশেষ-উৎসাহ-সহকারে সদর্প পাদ-বিক্ষেপপূর্ব্বক আগমন করিলেন। ধর্ম্মদেব ন্যায়-দণ্ডের সুবিমল প্রভায় তাঁহাদের প্রকৃত স্বরূপ অবলোকন করিয়া কহিলেন,—"তোমরা এ বিষয়ে উপযুক্ত বটে; তোমরা উদ্যোগী, পরিশ্রমী ও কর্ম্মদক্ষ; তোমাদের বিলক্ষণ বিষয়জ্ঞান আছে, কিন্তু ধর্ম্মরক্ষায় যত্ন নাই; তোমরা স্বার্থ-পরবশ হইয়া, পর-পীড়া কর, উৎকোচ গ্রহণ কর, এবং স্বীয় প্রভুর অপচয় কর। এ সকল কুব্যবহার পরিত্যাগ না করিলে, কোন প্রকারে তোমাদের সম্ভ্রম-জনক পদলাভে অধিকার জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।" এই কথা বলিয়া, তাহাদের মধ্যে শতকে এক বা দুইজনকে গ্রহণ করিয়া, অপরাপর সকলের আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। তদনন্তর তিনি সংসারের বিষয়-কার্য্য-সম্পাদনার্থে পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর কতক লোক আহ্বান করিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যেমন জ্ঞানাপন্ন ও ধর্ম্মশীল, বিষয় কার্য্যে সেরূপ অভিজ্ঞ ও অনুরক্ত নহেন। তবে যে কয়জন ত্রি-গুণ-সম্পন্ন, সুতরাং তিন শ্রেণীতে উপযুক্ত ও পদ-গ্রহণে সম্মত ও অভিলাষী হইলেন, তাঁহাদিগকে অত্যুৎকৃষ্ট সম্ভ্রান্ত পদ সমুদায় সমর্পণ করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করিয়া দিলেন, ভূ-মণ্ডলে ইহারাই সর্ব্বমান্য, পরম পূজ্য প্রধান মনুষ্য। তৎপরে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, যাহারা দুই গুণসম্পন্ন তাহাদিগকে তদপেক্ষা অপকৃষ্ট পদে স্থাপন করিলেন এবং অবশেষে যাহাদের কেবল বিষয়-কার্য্যে নৈপুণ্য আছে, তাহাদিগকে অতি অপকৃষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদে,

নিযুক্ত করিলেন, আর উৎকোচগ্রাহী পরপীড়ক পাপাত্মা অপহারীদিগকে তথা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তন্মধ্যে দেখিলাম, পূর্ব্বে যাঁহারা রাজ-সংক্রান্ত উন্নত পদে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের অনেকে এইরূপ মানচ্যুত ও তিরস্কৃত হইয়া, সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। পূর্ব্বে তাঁহারা যাহাদিগকে মনুষ্য বলিয়া গণ্য করিতেন না, তাহারা পদস্থ হইয়া, তাঁহাদের এইরূপ বিষম দুর্দ্দশা দর্শন করিতে লাগিল। কতিপয় ইংরেজ-জাতীয় রাজকর্ম্মচারীর অপমানের কথা কি কহিব! তাঁহারা ক্রমাগত নানা দুষ্টাচরণ করিয়াও একাল পর্য্যন্ত কেবল সহায়-বলে ও বুদ্ধি-কৌশলে সমুদায় প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে ধর্ম্ম-পুরুষের ন্যায়রূপ দণ্ড-জ্যোতিঃ সহ্য করিতে না পারিয়া, লজ্জিত ও অপমানিত হইলেন, এবং কতিপয় বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁহাদের পদে অভিষিক্ত হইয়া যশস্বী হইতে লাগিলেন।

কিন্তু ইহাতেও বিস্তর মান্য পদ শূন্য থাকিল দেখিয়া, ধর্ম্ম-পুরুষ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কতকগুলি জ্ঞানাপন্ন শান্ত-স্বভাব পরিশ্রম বিমুখ ব্যক্তিকে যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিয়া মৃদুভাবে মধুরস্বরে কহিতে লাগিলেন,—"তোমরা বিদ্যাবান্ ও ধর্ম্মশীল বটে; কিন্তু এ প্রকার গুণসম্পন্ন হইয়া, আলস্যের বশীভূত থাকা উচিত নয়। কতকগুলি পুস্তক-সমভিব্যাহারে বিরলে কাল যাপনার্থে বিদ্যার সৃষ্টি হয় নাই, এবং সংসারের শুভাশুভ তাবৎ বিষয়ে উপেক্ষা করিয়া, অনুৎসাহে কালক্ষেপণ করাও ধর্ম্মের উদ্দেশ্য নয়। ভূ-মণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া, যদি সংসারের কার্য্যই না করিলে, তবে জীবন ধারণের ফল কি? শিক্ষিত বিদ্যাকে যদি জগতের উপকারার্থে নিয়োগ না করিলে, তবে সে বিদ্যার প্রয়োজন কি? যদি সকলেই তোমাদের ন্যায় বৃথা কাল হরণ করে, তবে এক দিবসেই লোক যাত্রার উচ্ছেদ-দশা উপস্থিত

হয়। তোমরা বলিয়া থাক, আমরা আকাঙ্ক্ষার হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, সন্তোষ অবলম্বন করিয়াছি; কিন্তু তোমাদের যে প্রকার হীন অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে এরূপ নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নয়। তোমরা কোনক্রমে প্রাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছ; সমুচিত অন্ন-বস্ত্রাদি আহরণেও সমর্থ নহ। যথেষ্ট উপাদেয় অন্ন, অক্লেশ-জনক পবিত্র বস্ত্র, প্রশস্ত পরিষ্কৃত বাটী, এবং অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাভাবে তোমাদের পরিবারেরা ক্লিষ্ট ও পীড়িত হইয়া অশেষ-প্রকার দুঃখ পাইতেছে; তাহাদের রোগ হইলে ব্যয়সাধ্য-প্রযুক্ত তাহার যথোচিত চিকিৎসা হয় না, স্বচ্ছন্দভাবে তোমাদের সন্তানদিগের শরীরপুষ্টি ও মনঃস্ফূর্ত্তি হয় না এবং ধনাভাবে তাহারা উৎকৃষ্ট শিক্ষাও প্রাপ্ত হয় না। ইহাতে তোমাদের দ্বারা বিবিধ-মতে পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করা হইতেছে। ক্ষমতা সত্ত্বে এ প্রকার অবস্থায় তৃপ্ত থাকিয়া, এই সমস্ত দুঃখ-নিরাকরণে যত্ন না করা, অবশ্যই দূষণীয় বলিতে হয়। আমার অঙ্গ-স্বরূপ যে সন্তোষ, তাহার এরূপ স্বভাব নয়। আপন আপন ক্ষমতানুযায়ী অবস্থাতে তৃপ্ত থাকা এবং যে দুঃখ নিবারণের উপায় নাই, তাহাতে ব্যাকুলিত না হইয়া, ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক প্রসন্ন-ভাবে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করাই প্রকৃত সন্তোষের লক্ষণ। এইরূপ সন্তোষে পুণ্য ও প্রতিষ্ঠা দুই আছে। অতএব তোমাদের আত্ম-হিত ও সংসারের উপকারার্থে সচেষ্ট হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; তাহা হইলে, তোমরাই এই সকল সম্ভ্রান্ত পদের অধিকারী হইতে পার।"

ধর্ম্মের এই সকল মধুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া, আমি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম, এবং সাতিশয় শ্রদ্ধাবিষ্ট হইয়া, মনে মনে পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিলাম। এমন সময়ে উদাসীনদিগের স্থানান্তর-

যাত্রার্থ উদ্যোগ ধ্বনি শুনিয়া, আমার স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। তখন আমি সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া উঠিলাম, এবং এই পরম-রমণীয় স্বপ্ন-ব্যাপার সম্পূর্ণ সফল হউক বলিয়া, বার বার প্রার্থনা করিলাম।

জীব-বিষয়ে পরমেশ্বরের কৌশল ও মহিমা।

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড-পতির অত্যাশ্চর্য্য সুচারু কৌশল প্রদর্শন করিতেছে। সকল পদার্থই তাঁহার অপরিসীম জ্ঞান ও অচিন্তনীয় শক্তি প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার অপার করুণার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, সর্ব্বস্থানেই বিদ্যমান রহিয়াছে। জীবের শরীর অতি আশ্চর্য্য শিল্প-কার্য্য। তাহার প্রত্যেক অঙ্গ পরাৎপর পরম শিল্পকরের নিরুপম নৈপুণ্য-পক্ষে নিরন্তর সাক্ষ্যদান করিতেছে। বিশেষতঃ যখন দেখা যায়, তিনি স্থল-বিশেষে আপনার অবলম্বিত পদ্ধতির অন্যথা করিয়াও কোন বিষয়ে কোন জীবের অপ্রতুল পরিহার করিতেছেন, তখন তিনি আমাদের মানস-মন্দিরে স্পষ্টরূপে আবির্ভূত হইয়া উঠেন। এস্থলে তাঁহার উল্লিখিতরূপ অনির্ব্বচনীয় কৌশলের কতিপয় উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে, পাঠকবর্গ তাহা পাঠ করিয়া, একবার চমৎকার-সংবলিত ভক্তি-রসামৃতে অভিষিক্ত হউন।

বিশ্বপতির শক্তি বিচিত্র; সুতরাং তাঁহার কার্য্যও বিচিত্র। কিন্তু তিনি কোন নিগূঢ় অভিসন্ধি-ব্যতিরেকে কাহাকেও কোন বিশেষ

শক্তি ও বিশেষ অঙ্গ প্রদান করেন নাই। সমুদায় প্রাণীই এই পরমার্থ কথার প্রমাণ স্থল। হস্তী যেমন প্রকাণ্ড-কায়, জগদীশ্বর তাহার গ্রীবাদেশ তদনুরূপ দীর্ঘ করেন নাই; কারণ উহা অত্যন্ত দীর্ঘ হইলে, মস্তকের ভরে অবনত হইয়া পড়িত। কিন্তু এতাদৃশ উন্নত জন্তুর গ্রীবা-দেশ আবশ্যকমত দীর্ঘ না হইলে, তাহার পান-ভোজন সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন হয়। গ্রীবা-দেশ খর্ব্ব হওয়াতে হস্তিগণ গো-মহিষাদির ন্যায় মস্তক অবনত করিয়া, জলপান ও তৃণপত্রাদি ভক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। করুণাময় পরমেশ্বর এই সমুদায় অলোচনা করিয়া, তাহাকে একটি সুদীর্ঘ হস্ত অর্থাৎ শুণ্ড প্রদান করিয়াছেন। আহা! পরম শিল্প কুশল বিশ্ব-নির্ম্মাতা তাহার ঐ কর-নির্ম্মাণে যে পর্য্যন্ত পটুতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, হৃদয়পদ্ম বিকশিত হইয়া, তাঁহার গুণানুচিন্তনে অনুরক্ত হয়। উহার শিরা, অস্থি ও মাংস-পেশী যেরূপ বিন্যস্ত হইলে, উহাকে ইচ্ছানুসারে সঙ্কোচন ও প্রসারণ করিয়া, প্রয়োজনমতে সকল দিকেই সঞ্চালন করা যায়, উহা দ্বারা জলাশয় হইতে জল আকর্ষণ ও বৃক্ষ হইতে শাখা পল্লবাদি ভঞ্জন করা যায়, এবং সকল প্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য অনায়াসে গ্রহণ ও উত্তোলন করা যায়, জগদীশ্বর তাহা সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়াছেন। বিশেষতঃ উহার অগ্রভাগের এরূপ সুন্দর গঠন করিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা এক একটি তৃণ পর্য্যন্ত গৃহীত হইতে পারে। আমাদের হস্তের অঙ্গুলি এবং হস্তীর শুণ্ডের অগ্রভাগ উভয়ই তুল্যরূপ উপকারী। উভয়েরই দ্বারা এক প্রকার প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব হস্তীর হস্ত যে সুনিপুণ শিল্প-করের কার্য্য, তাহার সন্দেহ নাই। তাহার এই অঙ্গটি অনন্ত-সাধারণ অর্থাৎ অন্য

অন্য পশু এরূপ সুদীর্ঘ শুণ্ড প্রাপ্ত হয় নাই। সে সকল পশুর উহাতে প্রয়োজন নাই বলিয়াই পরমেশ্বর তাহাদিগকে উহা প্রদান করেন নাই। তিনি অসাধারণ স্থলেই অসাধারণ কৌশল প্রকাশ করিয়া মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন।

চর্ম্মচটিকার * জঙ্ঘা ও পদ অত্যন্ত অপটু; এ নিমিত্ত তাহারা ভূতলে ধাবমান হইতে পারে না, এবং উপবিষ্ট হইলে, উত্থিত হইতেও সমর্থ হয় না। তাহাদের এই স্বভাব-সিদ্ধ দোষ পরিহারের অন্য প্রকার উপায় না থাকিলে, তাহাদের তুল্য ভাগ্যহীন জীব পৃথিবীতে আর দৃষ্ট হওয়াও সুকঠিন হইত। তাহাদিগকে অনতিবিলম্বে হিংস্র পশুর গ্রাস-মধ্যে পতিত হইয়া, মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইত। কিন্তু বিশ্ব-পিতা পরমেশ্বর ইহার সুন্দর প্রতিবিধান করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি তাহাদের পক্ষযুগের এক এক কোণে লৌহময় বড়িশবৎ এক একটি বক্র নখ প্রদান করিয়াছেন। তাহারা পর্ব্বত-গহ্বর ও গৃহপ্রভৃতির রন্ধ্রাদির মধ্যে সেই নখ নিবেশিত করিয়া লম্বমান থাকে, এবং আবশ্যক মতে তাহা উন্মোচন করিয়া, স্থানান্তরে প্রস্থান করে। জগদীশ্বর অন্য কোন বিহঙ্গমজাতির পতত্রে এতাদৃশ বক্র নখর নির্ম্মাণ করিয়া দেন নাই; চর্ম্মচটিকার জীবন-রক্ষার্থ ইহা আবশ্যক বলিয়াই তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। তিনি একটি পরমাণুও কোন স্থানে নিরর্থক স্থাপন করেন নাই! তাঁহার সমস্ত অদ্ভুত কৌশল প্রতীতি করা কত আনন্দের বিষয়!

ঊর্ণনাভের জালও উল্লিখিতরূপ মনোহর কৌশলের এক সুন্দর

* চামচিকা।

উদাহরণ-স্থল। তাহারা মক্ষিকা ভোজন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে; কিন্তু তাহাদের উড্ডীয়মান হইয়া, মক্ষিকাগণকে আক্রমণ ও হনন করিবার সামর্থ্য নাই। তাহাদের ভক্ষ্য-গ্রহণের উপায়ান্তর না থাকিলে, জীবন রক্ষা করা, কোন ক্রমেই সম্ভব হয় না; এই বিবেচনায় বিশ্ব-পালক পরমেশ্বর তাহাদিগকে জাল প্রস্তুত করিবার শক্তি দিয়াছেন। তাহারা ধীবরদিগের ন্যায় জাল বিস্তৃত করিয়া অবস্থিতি করে, এবং মক্ষিকাগণ যেমন আসিয়া পতিত হয়, তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করে।

বহুরূপ-নামক প্রাণীর বর্ণ-পরিবর্ত্তনের বিষয় অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে। যিনি সমুদ্র-তটস্থ বালুকা-বিন্দু ও দূর্ব্বাদলস্থ শিশির-বিন্দু পর্য্যন্ত কোন বস্তু নিষ্প্রয়োজনে সৃষ্টি করেন নাই, তিনি যে এই অদ্ভুত জন্তুকে এই অদ্ভুত শক্তি নিরর্থক দিয়াছেন, অথবা কেবল মনুষ্যের কৌতুক-সম্পাদনার্থ প্রদান করিয়াছেন, ইহা কদাচ যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। তাহার অবশ্যই কোন নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে, তাহার সন্দেহ নাই। মক্ষিকাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গ বহুরূপের স্বভাব-সিদ্ধ খাদ্য। উহা বৃক্ষ ও গুল্মে আরোহণ ও রসনা-প্রসারণ করিয়া, তাহাদিগকে গ্রহণ ও ভক্ষণ করিয়া থাকে; কিন্তু উহার গতি অত্যন্ত মৃদু। পতঙ্গগণ উহাকে নিকটে দেখিলে, অবলীলাক্রমে পলায়ন করিতে পারে। বিশেষতঃ পতঙ্গের দৃষ্টি-শক্তি বিলক্ষণ তেজস্বিনী; কোন হিংস্র জীব নিকটস্থ হইলে, তাহারা অনায়াসে দেখিতে পায়। অতএব কোন প্রকার ছদ্মবেশ-গ্রহণ-ব্যতিরেকে, বহুরূপের অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া কোন মতেই সম্ভবে না; এই নিমিত্ত সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব-শক্তিমান্ পরমপুরুষ তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে রূপ-পরিবর্ত্তনের শক্তি প্রদান করিয়া, অপার মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন! বহুরূপ যখন

হরিদ্বর্ণ বৃক্ষপত্রের মধ্য দিয়া গমন করে, তখন হরিদ্রূপ গ্রহণ করে, এবং যখন পীত ও লোহিতবর্ণ পত্র বা পল্লবের নিকট দিয়া গমন করে, তখন পীত ও লোহিতবর্ণ ধারণ করে। চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পত্র-পুঞ্জের কেবল বর্ণ ধারণ করিয়া নিস্তার পায় না; তদীয় আকারেরও অনুকরণ করে। কি আশ্চর্য্য শক্তি! কি অনুপম গুণ! কি অপূর্ব্ব লীলা! কি অদ্ভুত কৌশল!

প্রাকৃতিক-ইতিবৃত্ত-বিৎ পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন, স্থলচর ও জলচরের চক্ষুর গঠন-বিষয়ে পরস্পর অনেক বিভিন্নতা আছে। স্থলচরেরা কেবল স্থলের উপরিস্থিত বস্তু দেখিতে পায়, জলচরেরা কেবল জলাশয়ের অভ্যন্তরস্থ সামগ্রী দৃষ্টি করিতে পারে। কিন্তু এক প্রকার মৎস্য আছে* তাহার চক্ষুর উপরিভাগ স্থল চরের এবং অধোভাগ জলচরের চক্ষুর তুল্য।—জগদীশ্বর কি অভিপ্রায়ে এ স্থলে সাধারণ পদ্ধতির অন্যথাচরণ করিলেন, ইহা জানিবার নিমিত্ত কাহার কৌতূহল-শিখা উদ্দীপ্ত না হইয়া উঠে? এবং পণ্ডিতেরা এ বিষয়ের যে নিগূঢ় অভিসন্ধি অবধারণ করিয়াছেন, তাহা শ্রুতি-গোচর হইলে, কাহারই বা বিস্ময় ও আনন্দোদয় না হইয়া থাকে? উল্লিখিত অসাধারণ মৎস্য যেরূপে সন্তরণ দেয়, তাহাতে তাহার চক্ষুর উর্দ্ধভাগ জলের উপর উত্থিত ও অধোভাগ তাহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকে। অতএব তাহাদিগের চক্ষুর গঠন একরূপ হইলে, তাহাদিগের দৃষ্টি-ক্রিয়া কদাচ সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে না, এই বিবেচনায়, করুণাময় পরমেশ্বর তাহাদের নেত্র-দ্বয়ের গঠন-প্রণালী উভয়-রীতি-সম্পন্ন করিয়া অপূর্ব্ব কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। যিনি সচেতন জীবে অচেতন উদ্ভিদের গুণ সংস্থাপন করিয়া, পুরুভুজের প্রকৃতি উৎপাদন

* ইংরাজিতে ইহাকে সরিনামমস্প্রাট্‌ বলে।

করিয়াছেন, তিনি উভয় জীবের স্বভাব একত্র মিলিত করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

জগদীশ্বর জীব সাধারণকে দুই চক্ষু প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু কোন কোন পতঙ্গের বহু নেত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ কি? জ্ঞান-সিন্ধু-স্বরূপ দীনবন্ধু কি মঙ্গলময় অভিপ্রায়ে সাধারণ পদ্ধতির এইরূপ অন্যথাচরণ করিলেন, ইহা জানিবার নিমিত্ত অন্তঃ-করণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। তাঁহার কৃপা-ভাজন জ্ঞানিগণ ইহার সিদ্ধান্ত করিয়া, আমাদিগকে অবগত করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত পতঙ্গ-সমুদায়ের নেত্র নিতান্ত নিশ্চল। তাহাদের চক্ষুর তারা এক স্থানেই স্থির হইয়া থাকে। আমরা যেমন ইচ্ছানুসারে সকলদিকেই চক্ষুর চালনা করিতে পারি, তাহারা সেরূপ পারে না। অতএব এরূপ দুই চক্ষু দ্বারা তাহাদের ভক্ষ্য অন্বেষণ ও শত্রুগণের গমনাগমন নিরীক্ষণ করা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না, ইহা বিবেচনা করিয়া, পরম বিজ্ঞানবিৎ পরমেশ্বর তাহাদিগকে বহু নেত্র প্রদান করিয়াছেন, এবং তৎসমুদায়কে তাহাদের শরীরের যে যে স্থানে স্থাপিত করিলে, সমধিক কল্যাণসাধন ও শোভা-সম্পাদন হয়, তাহাই করিয়াছেন। তিনি উল্লিখিত অভিপ্রায়ে ঊর্ণনাভকে অষ্টচক্ষু প্রদান করিয়াছেন। তাহার মস্তকের উপরিভাগে দুই, সম্মুখভাগে দুই, এবং এক এক পার্শ্বে দুই দুই নেত্র সন্নিবেশিত আছে। এই সমস্ত নেত্র নিতান্ত নিশ্চল হইলেও, প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হওয়াতে, ঊর্ণনাভ স্বকীয় জীবন-রক্ষা ও সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজন সাধনের উপযোগী সমুদায় বিষয়ই দৃষ্টি করিতে পারে। তাহার নেত্র নিশ্চল হওয়াতে, যত প্রকার অনিষ্টোৎপত্তির সম্ভাবনা ছিল, বিশ্ব-বিধাতা এইরূপ বিধান দ্বারা তাহার সম্পূর্ণ নিরাকরণ করিয়াছেন। আমরা যে আমাদের স্রষ্টা

ও পাতার এই সমস্ত অতি প্রগাঢ় নিগূঢ় অভিপ্রায়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইতেছি, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য ও অতুল আনন্দের বিষয়।

কিন্তু তিনি পূর্ব্বোল্লিখিত সমুদায় পতঙ্গেরই নেত্রদোষ যে এই এক প্রকারে নিবারণ করিয়াছেন, এমত নয়। তিনি এরূপ কল্যাণ অশেষরূপ উপায় দ্বারা সম্পাদন করিতে পারেন। তিনি কতকগুলি পতঙ্গের চক্ষুর তারা গোলাকৃতি না করিয়া, বহু-পার্শ্ব-বিশিষ্ট কাচ-সদৃশ করিয়া আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার এক এক পার্শ্ব এক একখানি কাচ-স্বরূপ; সুতরাং তাহার যে পার্শ্বে যে যে বস্তুর আভা পতিত হয়, সে বস্তু সেই পার্শ্ব দ্বারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে তাহাদের চক্ষুর তারা নিতান্ত নিশ্চল হইলেও, তাহার দৃষ্টি-ক্ষেত্র অন্য অন্য প্রাণীর তুল্য বহু বিস্তৃত হইয়া থাকে। এডাম্‌স্-নামক পণ্ডিত নিরূপণ করিয়া লিখিয়াছেন, একটি মধু-মক্ষিকার চক্ষে এইরূপ ১৪০০ চৌদ্দশত খণ্ড কাচ দৃষ্ট হইয়াছে। উল্লিখিত পতঙ্গের চক্ষুর তারার ঐ সমস্ত কাচবৎ ভাগ কিরূপ সূক্ষ্ম ও সুপরিপাটী-সম্পন্ন, ও পরম শিল্প-কুশল বিশ্ব-নির্ম্মাতার কত কৌশল ও যত্নের বিষয়, তাহা পাঠকবর্গ একবার চিন্তা করুন, এবং চিন্তা করত বার বার তাঁহার ধন্যবাদ করিয়া, পরম পবিত্র প্রেমানন্দ-নীরে নিমগ্ন হউন।

যদি প্রস্তুত বিষয়ে চক্ষুর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল, তবে এস্থলে জগদীশ্বরের আর একটি অসাধারণ কৌশলের উল্লেখ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না। সমুদায় দ্বি-নেত্র প্রাণীরই দুই পার্শ্বে দুই নেত্র দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু বংশক* প্রভৃতি কয়েক প্রকার মৎস্যের

* বাঁশপাতা।

উভয় নেত্রই এক পার্শ্বে থাকে, অপর পার্শ্বে একটিও চক্ষু থাকে না। এরূপ অসামান্য ব্যবস্থা কি বিশ্ব-স্রষ্টার ভ্রান্তি-মূলক? না, কোন বিশেষ প্রয়োজন-সাধনের উদ্দেশে এইরূপ ব্যবস্থিত হইয়াছে?—অভ্রান্ত-স্বরূপের কার্য্যে ভ্রান্তি সম্ভব, এ কথা মুখাগ্রে আনয়ন করা অকর্ত্তব্য। তিনি এ বিষয়ে আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। ঐ সমুদায় মৎস্য জলাশয়ের অধোভাগে পঙ্কের উপর এ প্রকার এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া রহে, যে তাহাদের ঐ পার্শ্ব সর্ব্বতো-ভাবে পঙ্কেতেই পরিলিপ্ত থাকে। সেই পার্শ্বে চক্ষু থাকিলে, তাহা কোন প্রকারে কার্য্যকর না হইয়া, কেবল ক্লেশ-কর হইবে, অথবা পঙ্কেতে অন্ধীভূত হইয়া যাইবে, এই বিবেচনায়, ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ তাহার একটি চক্ষুও সে পার্শ্বে স্থাপন না করিয়া, অপর পার্শ্বে উভয় নেত্রই স্থাপন করিয়াছেন। প্রত্যেক প্রাণীর প্রত্যেক নেত্র নেত্র-নির্ম্মাতার কতই কৌশল প্রদর্শন করিতেছে, এ স্থলে তিনি আবার কৌশলের উপর কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন!

বক ও তাদৃশ কতকগুলি পক্ষী মৎস্যাদি জলজন্তু ভক্ষণ করিয়া, প্রাণ ধারণ করে; কিন্তু হংসাদির ন্যায় তাহাদের পদাঙ্গুলি-সমুদায় চর্ম্মদ্বারা লিপ্ত না থাকাতে, তাহারা সন্তরণ করিতে সমর্থ হয় না; ইহাতে তাহাদের ভক্ষ্যের সহিত শারীরিক প্রকৃতির কিছুমাত্র সামঞ্জস্য থাকে না। কিন্তু ঐ উভয়ের সামঞ্জস্য সাধন করা সর্ব্বসামঞ্জস্য-সম্পাদক পরমেশ্বরের পক্ষে কত ক্ষণের কর্ম্ম? তিনি বকজাতির জঙ্ঘাদ্বয় কিঞ্চিৎ দীর্ঘ করিয়া, একেবারেই এ বিষয়ের সামঞ্জস্য করিয়া রাখিয়া-ছেন। তাহারা তীর-সন্নিহিত অগভীর জলে পদচারণ করিয়া, মৎস্যদিগকে গ্রহণ ও ভক্ষণ করে। তাহারা অপরাপর জল-চর পক্ষীর ন্যায় জলা শয়ে সন্তরণ করিতে সমর্থ না হউক না কেন, তাহাদের স্রষ্টা ও পাতা

অতীব সহজ কৌশলে তাহাদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সুন্দর উপায় অবধারণ করিয়া দিয়াছেন।

উষ্ট্রের কোন কোন অঙ্গ ও কোন কোন গুণ অতি অসাধারণ। তাহাদের খুর সমধিক প্রসারিত, তাহাদের পাক-স্থলীর একাংশে জল রাখিবার স্থান আছে, এবং স্থান-বিশেষে জলাশয় বিদ্যমান আছে কি না, তাহার দেড় ক্রোশ অন্তর হইতে, তাহা জানিতে পারে। গো, অশ্ব, মেষাদি অন্য অন্য পশুর এ সকল বিষয় এ প্রকার নয়। কিন্তু জগদীশ্বর যে অভিপ্রায়ে ঐ অসাধারণ পশুকে উল্লিখিত-রূপ অসাধারণ প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহার বিচার করিয়া দেখিলে, চমৎকৃত ও প্রীতিপূর্ণ হইয়া, কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র হইতে হয়। উষ্ট্র আরবদেশের প্রধান ভারবাহী পশু। তাহাদিগকে সতত যে বালুকাময় মরুভূমি পর্য্যটন করিতে হয়, তাহা প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে অগ্নিবৎ হইয়া থাকে। তথাকার বায়ু নিতান্ত নীরস ও উত্তপ্ত; তথায় জলাশয় নাই, লোকালয় নাই, বন ও উপবন নাই। চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া একটিও জীব-জন্তু দেখিতে পাওয়া যায় না। পথিকগণ যোজন যোজন পথ পর্য্যটন করিয়াও কোথাও বৃক্ষচ্ছায়া এমন কি তৃণ-মুষ্টিও দেখিতে পায় না। ক্ষুধা তৃষ্ণা যেন মূর্তিমতী হইয়া, নিরন্তর হাহাকার করিতেছে। কালরূপী মৃত্যু যেন তাহাদিগকে সহায় করিয়া, জীব-সংহারার্থ চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে। এইরূপ দুর্গম স্থানে উষ্ট্রদিগকে বণিক্‌দিগের পণ্যসামগ্রী পৃষ্ঠোপরি গ্রহণ করিয়া, নিরন্তর ভ্রমণ করিতে হইবে, এই বিবেচনায় জগদীশ্বর ঐ সকল অমূল্য পশুকে তদুপযোগী প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন। তাহাদিগকে সর্ব্বদাই বালুকা-ভূমি পর্য্যটন করিতে হয়, অতএব

শ্লথ বালুকা-মধ্যে বারংবার পদ প্রবিষ্ট হইয়া, গমনের ব্যাঘাত না জন্মায়, এই নিমিত্ত, তাহাদিগকে প্রশস্ত খুর প্রদান করিয়াছেন। তাহাদের উপরে জল রাখিবার এক স্থান করিয়া দিয়াছেন; তাহারা তথায় বারি সঞ্চয় করিয়া ক্রমাগত বহু দিবস নির্জ্জল দেশে ভ্রমণ করে ও প্রয়োজন মতে সেই জল উদ্গীর্ণ করিয়া, পিপাসা শান্তি করে ও শুষ্ক অন্ন সিক্ত করে। মরুভূমির মধ্যে সর্ব্বস্থানে জল প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর; অতএব, তাহাদিগকে এরূপ অসাধারণ ঘ্রাণশক্তি দিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা তাহারা দেড় ক্রোশ থাকিতে জলাশয়ের উপলব্ধি করিয়া, তদভিমুখে ধাবমান হয়। তাহাদের পৃষ্ঠোপরি যে স্থূলকায় ককুদ্ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল মেদরাশিতে পরিপূর্ণ পথের মধ্যে একাদিক্রমে অনেক দিবস আহার-সামগ্রী না মিলিলে, ঐ মেদ শোণিতের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া, তাহাদিগের জীবন রক্ষা করে। আহা! পরম করুণাময় জগদীশ্বরের কি মহিমা! ঐ সমস্ত বহূপকারী পশুকে অনেক বিষয়ে অসামান্য কার্য্য করিতে হয় বলিয়াই, তিনি তাহাদিগকে উল্লিখিত-রূপ অসামান্য প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন। তিনি তত্তৎ প্রদেশের বাণিজ্য-ব্যবসায় অপেক্ষাকৃত সুগম করিয়া, সংসারের সুখ-সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিবার অভিপ্রায়েই তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

মানব! তুমি এমন কত উদাহরণ প্রদর্শন করিবে? অনন্ত কালেও তাঁহার সমুদায় শুভাবহ কৌশল গণিত ও বর্ণিত হইবার নয়। যেমন সুধাময় পূর্ণ চন্দ্রের মনোহর জ্যোতিঃ সুবিস্তৃত সিন্ধু-সলিলে ও তদীয় তটে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া, পরম রমণীয় শোভা প্রকাশ করে, সেইরূপ আমাদের করুণাময় পরম-পিতার মহিমা-

চন্দ্রমার অনুপম অমৃত-রস এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্থানে পরিলিপ্ত হইয়া, তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় কীর্ত্তি অহর্নিশ প্রকাশ করিতেছে।

জোয়ার-ভাঁটা।

প্রতিদিন সমুদ্রের দুই বার বৃদ্ধি ও দুই বার হ্রাস হয়; ইহা দেখিয়া ও আলোচনা করিয়া, আপাততঃ সকলকেই বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, এবং কিরূপে এরূপ অদ্ভুত ব্যাপারের ঘটনা হইয়া থাকে, তাহা জানিবার নিমিত্ত সকলেরই কৌতূহল উপস্থিত হয়, তাহার সন্দেহ নাই। প্রাচীন হিন্দু-পণ্ডিতেরা সমুদ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্র যে উহার প্রধান কারণ, তাহাও তাঁহারা এক প্রকার অনুভব করিয়াছিলেন! এক্ষণে এ বিষয় যে কত দূর অবধারিত হইয়াছে, তাহার স্থূল তাৎপর্য্যমাত্র পশ্চাৎ প্রকাশিত হইতেছে।

জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, চন্দ্র পৃথিবীর আকর্ষণে আকৃষ্ট থাকিয়া, স্বীয় পথে পরিভ্রমণ করে। পৃথিবী যেমন চন্দ্রকে আকর্ষণ করে, চন্দ্রও সেইরূপ পৃথিবীকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের জল স্ফীত হইয়া উঠে। ইহাকেই সংস্কৃত ভাষায় বেলা ও এতদ্দেশীয় চলিত ভাষায় জোয়ার বলে। চন্দ্র অবশ্য পৃথিবীর স্থল ও জল উভয় ভাগই আকর্ষণ করে; কিন্তু স্থলভাগ কঠিন ও দৃঢ়, এ নিমিত্ত বিচলিত হয় না। জলভাগ অতিশয় তরল, এই নিমিত্ত চন্দ্রের আকর্ষণে চলিত ও স্ফীত হইয়া থাকে। পৃথিবীর যে অংশ যখন চন্দ্রের নিকট থাকে, তখন

সেই অংশে জোয়ার হইবার সম্ভাবনা। ইহাতে দিবারাত্রে এক স্থানে একবার মাত্র জোয়ার হইতে পারে; কিন্তু আমরা দিনরাত্রে দুইবার জোয়ার ও দুইবার ভাঁটা দেখিতে পাই। এ অদ্ভুত ঘটনার কারণ কি, পশ্চাৎ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

এই চিত্রক্ষেত্রে চ চন্দ্র; ক খ গ ঘ পৃথিবী; খ সুমেরু অর্থাৎ উত্তর প্রান্ত; গ কুমেরু অর্থাৎ দক্ষিণ প্রান্ত; ছ পৃথিবীর কেন্দ্র অর্থাৎ মধ্যস্থল। এ বিষয় সহজে বুঝিবার নিমিত্ত, পৃথিবী চতুর্দ্দিকে জলে বেষ্টিত :- জ্ঞান করিতে হইবে। পৃথিবীর ক-চিহ্নিত স্থান চন্দ্রের ঠিক নিম্নভাগে অবস্থিত, এবং অন্য অন্য অংশ অপেক্ষায় নিকটবর্ত্তী; এ নিমিত্ত সেই স্থানের জল, চন্দ্র কর্ত্তৃক অধিক আকৃষ্ট হওয়াতে, স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, এবং তদপেক্ষা দূরবর্ত্তী খ এবং গ চিহ্নিত স্থান সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে অর্থাৎ ক স্থানে জোয়ার এবং খ ও গ স্থানে ভাঁটার উৎপত্তি হইয়াছে। ঘ-চিহ্নিত স্থান সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী; এ নিমিত্ত চন্দ্রের আকর্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প এবং তাহার উপরিস্থিত সমুদায় ভাগে তদপেক্ষায় অধিক; কারণ যে বস্তু যত:নিকটে থাকে, আকর্ষক পদার্থ তাহাকে তত তেজে আকর্ষণ করে। অতএব, ঐ ঘ-চিহ্নিত জলীয় ভাগ-ব্যতিরেকে অবশিষ্ট সমুদায় ভাগ চন্দ্র কর্ত্তৃক অধিক আকৃষ্ট হওয়াতে, চন্দ্রের দিকে কিছু উত্থিত হয়, এ নিমিত্ত ঐ সর্ব্বাপেক্ষা অধঃস্থিত ঘ-চিহ্নিত ভাগ নিম্ন দিকে লম্বিত হইয়া পড়ে। ঐ ভাগ নত হইয়া পড়া ও অবশিষ্ট ভাগ
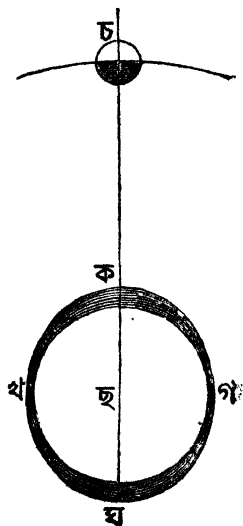
উঠিয়া যাওয়া উভয়ই তুল্য। এই নিমিত্ত ক ও ঘ চিহ্নিত উভয় স্থানে এক সময়ে জোয়ার হইয়া থাকে।

ভূ-মণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তু ভূ-মণ্ডলের কেন্দ্রাভিমুখে অর্থাৎ মধ্যদিকে আকৃষ্ট হয় এবং যে বস্তু পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে যতদূরে অবস্থিত, তাহাতে পৃথিবীর আকর্ষণ তত অল্প। যখন পৃথিবীর ছ-চিহ্নিত কেন্দ্র অর্থাৎ মধ্য-ভাগ চন্দ্র কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া চন্দ্রের দিকে উত্থিত হয়, তখন ঘ-চিহ্নিত স্থান ঐ কেন্দ্র হইতে অধিক দূর পতিত হওয়াতে, তথায় পৃথিবীর আকর্ষণ অল্প হইয়া যায়। সে স্থানের জল আকর্ষণ-শক্তিতে আকৃষ্ট থাকে, তাহার হ্রাস হইলে, সেই জল সুতরাং নত হইয়া পড়ে।

এইরূপে সমুদ্রের যে অংশে যখন জোয়ারের উৎপত্তি হয়, তাহার বিপরীত ভাগেও সেই সময়েই জোয়ার হইয়া থাকে। যখন চন্দ্র-মণ্ডল আমাদের মস্তকোপরি অবস্থিত থাকে, তখন ভূমণ্ডলের যে ভাগে আমাদের অবস্থান, সেই ভাগে এবং তাহার বিপরীত ভাগে এক কালে জোয়ার হয়। সেইরূপ যখন চন্দ্র আমাদের বিপরীত দিকে থাকে, তখনও সেই দিকে ও আমাদের দিকে এক কালেই জোয়ারের উৎপত্তি হয়। এইরূপে প্রতিদিন এক এক স্থানে দুই বার করিয়া সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকে।

এ বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, তাহা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে, অনায়াসে প্রতীত হইতে পারে, চন্দ্র-মণ্ডল ভূ-মণ্ডলের এক স্থান অপেক্ষা অন্য স্থানকে অধিক আকর্ষণ করে, ইহাতেই জোয়ারের উৎপত্তি হয়। সূর্য্য পৃথিবী হইতে এত দূরে অবস্থিত যে, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাহার আকর্ষণের তাদৃশ ইতর-বিশেষ অনুভূত হয় না। এ নিমিত্ত চন্দ্রের আকর্ষণ জোয়ার-ভাঁটার উৎপত্তির প্রতি যেমন বলবৎ কারণ, সূর্য্যের আকর্ষণ সেরূপ নয়। যদিও তত না হউক, তথাপি সূর্য্যমণ্ডলও চন্দ্রের ন্যায় সমুদ্রের জল আকর্ষণ করে, এবং তদ্দ্বারা জোয়ারের হ্রাসবৃদ্ধিও সাধন

করিয়া থাকে। কিরূপে সূর্য্যের দ্বারা জোয়ারের হ্রাস-বৃদ্ধি সাধিত হইয়া থাকে, পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে।

যে সময় চন্দ্র সূর্য্য উভয়ে মিলিয়া এক স্থানের জল আকর্ষণ করে, সে সময়ে জোয়ার অত্যন্ত প্রবল হয়। অমাবস্যার সময় সূর্য্য চন্দ্র উভয়ে প্রায় সমসূত্রপাতে অবস্থিত হয়. অর্থাৎ তৎকালে চন্দ্রমণ্ডল সূর্য্য-মণ্ডলের অধোভাগে অবস্থিতি করে। অতএব উভয়ে এক দিকে থাকিয়া এক স্থানের জল আকর্ষণ করাতে, সে সময়ে জোয়ারের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হয়। পূর্ণিমার সময়ে সূর্য্য ও চন্দ্র পরস্পর নভোমণ্ডলের বিপরীত ভাগে উদয় হয়। চন্দ্র যখন পূর্ব্ব ভাগে, সূর্য্য তখন পশ্চিম ভাগে অবস্থিতি করে, এবং চন্দ্র যখন পশ্চিমদিকে, সূর্য্য তখন পূর্ব্ব ভাগে অবস্থিতি করে, এবং চন্দ্র যখন পশ্চিম দিকে, সূর্য্য তখন পূর্ব্ব দিকে উদয় হয়। পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে, চন্দ্র-মণ্ডল ভূমণ্ডলের যে ভাগের উপর যখন অবস্থিতি করে, তখন সেই ভাগে ও তাহার বিপরীত ভাগে জোয়ারের উৎপত্তি হয়, সেই ভাগের ও তাহার বিপরীত ভাগের জলও সূর্য্য দ্বারা এক সময়েই উচ্ছ্বসিত হয়। অতএব যখন চন্দ্র সূর্য্য পরস্পর বিপরীত দিকে থাকে, তখনও উভয়ের আকর্ষণ পরস্পর উভয়ের আকর্ষণের সংহারক না হইয়া, উভয় দিকের জোয়ার প্রবল করিয়া তোলে। এই নিমিত্ত অমাবস্যার ন্যায় পূর্ণিমার সময়েও জোয়ারের সমধিক প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। এতদ্দেশীয় নাবিকেরা ইহাকেই কটাল কহে।

সপ্তমী ও অষ্টমী তিথিতে চন্দ্র সূর্য্য অমাবস্যার ন্যায় পরস্পর উপর্য্যধোভাবে অথবা পূর্ণিমার ন্যায় পরস্পর বিপরীত দিকে অবস্থিতি করে না; এ নিমিত্ত সে সময়ে জোয়ারের প্রাদুর্ভাব থাকে না। তখন সূর্য্য-মণ্ডলের আকর্ষণ-শক্তি জোয়ারের অনুকূল না হইয়া, প্রতিকূল হইয়া উঠে। এই চিত্রক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পৃথিবী, চ চন্দ্র,

সু সূর্য্য। সূর্য্য এক দিকে ঘ চিহ্নিত স্থানের জল আকর্ষণ করিতেছে, চন্দ্র অন্য দিক্ হইতে ঐ ঘ-চিহ্নিত স্থানের জল আকর্ষণ করিয়া গ-চিহ্নিত স্থানে তুলিতেছে। ইহাতে চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়ের আকর্ষণ পরস্পরের অনুকূল না হইয়া পরস্পরের প্রতিকূলই হইয়া উঠে। সূর্য্য অন্য দিক্ হইতে আকর্ষণ না করিলে, চন্দ্র আরও অধিক জল উত্তোলন
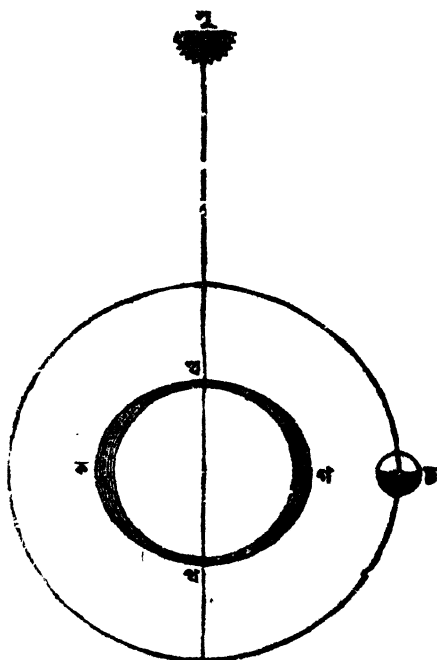
করিতে পারিত। কিন্তু তাহা না পারাতে, গ-চিহ্নিত স্থানে জোয়ারের প্রাদুর্ভাব হয় না। সূর্য্য ঘ-চিহ্নিত স্থানের জল আকর্ষণ করাতে, তথায় ভাটারও আধিক্য হইতে পারে।

চন্দ্র ও সূর্য্য সকল সময়ে পৃথিবী হইতে সমান দূরে অবস্থিত থাকে না। কখনও কিছু নিকটে কখনও কিঞ্চিৎ দূরে গমন করে। যখন অধিক নিকটবর্ত্তী হয়, তখন সমুদ্রের জল অধিক আকর্ষণ করে এবং যখন দূরবর্ত্তী হয়, তখন তদনুরূপ অল্প-প্রমাণ জল আকর্ষণ করিয়া থাকে। ইহাতেও জোয়ার-ভাঁটার অনেক ইতর-বিশেষ হয়, তাহার সন্দেহ নাই। যে সময়ে চন্দ্র-মণ্ডল ভূ-মণ্ডলের সমধিক সমীপবর্ত্তী হয়, সে সময়ে অমাবস্যা বা পৌর্ণমাসী সঙ্ঘটন হইলে, জোয়ারের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। এ দেশীয় নাবিকেরা ইহাকে তেজ কটাল বলে।

জোয়ারের জল সকল স্থানে সমান দূর উত্থিত হয় না। যে সকল জলাশয় প্রশস্ত নয়, তাহাতেই অধিক দূর উত্থিত হয়; যে সমস্ত অত্যন্ত প্রশস্ত, তাহাতে সেরূপ উত্থিত হয় না। অতিবিস্তৃত পাসিফিক্ মহাসাগরের কোন দ্বীপে দুই এক ফুটের অধিক উঠে না, কিন্তু ব্রিটিস চানেল্ নামক অনতিবিস্তৃত সাগরের তট-স্থিত সেণ্ট্ মেলো নগরে জোয়ারের জল ৩৩ তেত্রিশ হাত উচ্চ হয় ও আমেরিকার অন্তর্ব্বর্ত্তী নবস্কোশিয়া প্রদেশে ৪৭ সাতচল্লিশ হাত পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়া থাকে। নদীর মধ্যেও জোয়ারের জল উচ্চ হইয়া, অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করে। এতদ্দেশীয় গঙ্গানদীর বিষয় প্রসিদ্ধই আছে। আমেরিকার অন্তর্ব্বর্ত্তিনী আমেজন-নদীর মুখ হইতে তাহার অভ্যন্তরে ২২০ দুই শত কুড়ি ক্রোশ অপেক্ষাও অধিক দূর জোয়ার যায়। ইহাতে এত সময় লাগে যে, এক জোয়ার নিঃশেষিত না হইতে হইতে অন্য জোয়ারের জল নদী-মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে থাকে।

ভাঁটার সময়ে নদীর জল নির্গত হইয়া যখন মোহানায় পতিত হয়, তখন যদি সমুদ্রে পুনর্ব্বার প্রবল জোয়ার উৎপন্ন হইয়া, মোহানার দিকে আসিতে থাকে, তাহা হইলে, উভয় প্রবাহ পরস্পর সম্মুখীন ও

প্রতিহত হইয়া, জলময় প্রাচীরের ন্যায় উচ্চ হইয়া উঠে এবং সেই জলরাশি সতেজে নদীমধ্যে প্রবেশ করিয়া, প্রচণ্ড-বেগে গমন করিতে থাকে, ইহাকেই বান কহে। জীব, জন্তু, নৌকা প্রভৃতি যাহা কিছু ইহার সম্মুখে পতিত হয়, তাহাই জলমগ্ন ও বিনষ্ট হইয়া যায়। কলিতাতায় বানের সময় বড় বড় জাহাজ প্রভৃতি দোলায়মান হইতে থাকে এবং কখন কখন নঙ্গরের বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। পূর্ব্বোল্লিখিত আমেজন-নদীর বান ভয়ঙ্কর জলময় পর্ব্বতের ন্যায় একশত বিংশতি হস্ত উন্নত হইয়া, প্রচণ্ডবেগে ধাবিত হইতে থাকে।

ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড!

অখিল বিশ্বের তুলনায় পৃথিবীকে একটি বিন্দু বলিলে বলা যায়। কিন্তু এই ভূ-মণ্ডলও যে প্রকার প্রকাণ্ড পদার্থ, তাহা অনুভব করা সুকঠিন। সমগ্র ভূ-মণ্ডল দূরে থাকুক, ভারত-ভূমির উত্তর সীমাবর্ত্তী হিমালয় ও আমেরিকার পশ্চিম প্রাচীর-স্বরূপ আণ্ডিস্ পর্ব্বত প্রভৃতি যে সমস্ত শত শত যোজন-ব্যাপিনী পর্ব্বত-শ্রেণী মেঘ-শ্রেণী ভেদ করিয়া, স্বীয় মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে, তাহাও মনেতে ধারণ করা সহজ নয়। অতীব গাম্ভীর্য্যশালী জন-শূন্য পর্ব্বতময় প্রদেশ অবলোকন করিলে, অন্তঃকরণ তাহাদের আকার-প্রকার সুস্পষ্ট গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া, ভীতি-সংবলিত চমৎকার-রসে নিমগ্ন হইয়া যায়। কিন্তু সমগ্র ভূ-মণ্ডলের সহিত তুলনা করিলে, ঐ সমস্ত সুবিস্তৃত পর্ব্বতশ্রেণীও সামান্য বলিয়া বোধ হয়। যদি তৎসমুদায় উৎপাটন করিয়া, স্থির-সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে, তাহাদের শিখর-দেশের অগ্রভাগ-ব্যতিরিক্ত অন্যান্য সমস্ত ভাগই সমুদ্র-গর্ভে মগ্ন

হইয়া থাকে। অবনি-মণ্ডলে এমন কত সমুদ্র, কত দ্বীপ ও কত মহারণ্য ও মরুভূমি রহিয়াছে। এই অতি প্রকাণ্ড ভূমি-পিণ্ডের উপরি-ভাগ ন্যূনাধিক ৩,৮১,১০,৯০০ তিন কোটি একাশী লক্ষ দশ সহস্র নয় শত বর্গক্রোশ। * যদি কোন কৌতূহলাবিষ্ট পর্য্যটক সমগ্র ভূমণ্ডল-সন্দর্শন-বাসনায় প্রতিদিন এইরূপ ৬ ছয় ক্রোশ করিয়া ভ্রমণ ও দর্শন করিতে পারেন, তাহা হইলে, তাঁহার সমুদায় পৃথিবী পর্য্যবেক্ষণ করা ১৭,৪০০ সতর হাজার চারি শত বৎসরের ন্যূনে সম্পন্ন হয় না।

অবনি-মণ্ডলের আয়তন মাত্র অনুভব করিয়া নিরস্ত হওয়া উচিত নয়। ইহাতে যে সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার অহর্নিশ সম্পাদিত হইয়া, সর্ব্ব-মঙ্গলাকরের মঙ্গলকর কৌশল সম্পাদিত করিতেছে, তাহা একত্র এককালে অনুভব করা সাধ্যাতীত বোধ হয়। জল-প্রপাত পতিত হইতেছে, প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইতেছে, মেঘাবলি উৎপন্ন হইতেছে, শিলা ও সলিল বর্ষিত হইতেছে, নদী ও নির্ঝর প্রবাহিত হইতেছে, গিরি ও গহ্বর মেঘনাদে নাদিত হইয়া, ভূ-মণ্ডল কম্পমান করিতেছে, এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত উপস্থিত হইয়া, চতুষ্পার্শ্বে ভয়ঙ্কর ব্যাপার উদ্ভাবন করিতেছে। নরলোকে কোন স্থানে কোন পদার্থ মুহূর্ত্তেকের নিমিত্তে স্থির নহে। সকল পদার্থই সতত পরিবর্ত্তিত হইয়া, বিশ্বপতির অপার মহিমা প্রকাশ করিতেছে। আমরা চতুর্দ্দিকে কত জাতীয় কত মনুষ্যেই পরিবেষ্টিত রহিয়াছি। তাহাদের আহার বিহার সুখ সম্ভোগাদি কত ব্যাপার-ঘটিত কত প্রকার ক্রিয়া-কলাপ প্রতিনিমিষে নির্ব্বাহিত হইতেছে। দেশ-ভেদে, জাতি-ভেদে, তৎসমুদায় সম্পাদনের কত প্রকার

* এক ক্রোশ দৈর্ঘ্য ও এক ক্রোশ প্রস্থে এক বর্গ ক্রোশ হয়।

প্রণালীই বা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মনুষ্য-ব্যতিরিক্ত কোটি কোটি প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে অবস্থিত রহিয়াছে; কি বায়ু, কি সমুদ্র, কি অরণ্য, কি পর্ব্বত, কি নগর, কি রাজধানী, কি গ্রাম, কি উদ্যান, সর্ব্বস্থানই জীব জন্তুতে পরিপূর্ণ। এক এক বিন্দু প্রমাণ স্থানে অপ্রত্যক্ষ-গোচর সহস্র সহস্র কীটাণু ভ্রমণ করিতেছে। এমন স্থান নাই যে, তথায় জীব নাই! এমন স্থান নাই যে, তথায় সুখ ও সন্তোষের সঞ্চার নাই। জীবগণ আহার করিতেছে, ক্রীড়া করিতেছে, বিচরণ করিতেছে, সন্তরণ দিতেছে, নৃত্য করিতেছে, ধাবিত হইতেছে; তাহাদের সুখসাধনার্থে বিশ্বভাণ্ডার পরিপূর্ণ রহিয়াছে। সূর্য্য, বায়ু, মেঘ ও মেদিনী নিয়তই তাহাদের পরিচারণ ও সুখনিয়োজন করিতেছে, নিমেষ মাত্রও স্ব স্ব শুভ-কারিণী সুখ-দায়িনী শক্তি সঞ্চালন করিতে নিরস্ত নয়। এই অশেষ-প্রকার ব্যাপার এক কালে গ্রহণ করা কাহার সাধ্য? এই সমুদায় এক কালে অনুভব করিতে গিয়া অন্তঃকরণ পরাস্ত হইয়া আসিতেছে। যে অননুভবনীয় অনির্ব্বচনীয় মহীয়সী শক্তি দ্বারা এই সমস্ত উৎপন্ন হইয়া রক্ষিত হইতেছে, তাহা ধারণ করিতে গিয়া চিত্ত বিহ্বল ও বিভ্রান্ত হইতেছে। এই সমুদায় একত্র অনুভব করিতে পারিলে, যিনি এই বৃহৎ কার্য্যরাশির কারণ, এই অপরিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্যের রাজা, এই অশেষপ্রকার প্রজার অভিভাবক ও প্রতিপালক, তাঁহার অপার মহিমা কতক অনুভূত হইতে পারে।

যদি এই অবনি-রূপ একটিমাত্র লোকের বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া অন্তঃকরণ শ্রান্ত হইয়া উঠিল, তবে আমরা ব্রহ্মাণ্ডপতির অসীম ব্রহ্মাণ্ডের পর্য্যালোচনা-বিষয়ে কিরূপে কৃতকার্য্য হইব? মেদিনীর মেরু-দণ্ড স্বরূপ হিমালয়ের তুলনায় একটি কঙ্কর যেরূপ ক্ষুদ্র বোধ হয়, অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় ভূ-মণ্ডল তদপেক্ষা কদাচ বৃহত্তর নয়। পৃথিবী

জগতের যে প্রণালীর অন্তর্গত, তাহাকে সৌর জগৎ কহে। প্রকাণ্ড সূর্য্য-মণ্ডল তাহার মধ্যস্থানে অবস্থিত। ভূ-লোক ও ভূ-লোক-সদৃশ অন্য ১৭৯ এক শত উনআশীটি গ্রহ ও উপ-গ্রহ * ঐ বিশাল সূর্য্যলোকের চতুর্দ্দিকে প্রচণ্ড-বেগে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী নেপচ্যুনগ্রহ সূর্য্যের নিকট হইতে ন্যূনাধিক ১, ২৫, ০০, ০০,০০০ একশত পঞ্চবিংশতি কোটি ক্রোশ অন্তরে থাকিয়া, ১৬৪ একশত চৌষট্টি বৎসর ৭ সাতমাস ১৬ ষোল দিবসে তাহাকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। এক একটা গ্রহের আয়তন শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। একটা গ্রহ † ভূ-মণ্ডল অপেক্ষা প্রায় ৭৩৫ সাতশত পঁয়ত্রিশ গুণ, আর একটা ‡ প্রায় ১৪১৪ চৌদ্দ শত চৌদ্দ গুণ বৃহৎ। ঐ উভয়ের মধ্যে প্রথমোল্লিখিত গ্রহ এরূপ অতি প্রকাণ্ড বলয়-ত্রয়ে পরিবেষ্টিত যে, পৃথিবীর তুল্য শত শত জীব-লোক ঐ অঙ্গুরীয়কের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতে পারে। তদ্ভিন্ন কত সহস্র ধূমকেতু ও কত কোটি উল্কা-পিণ্ড সৌর-জগতে ভয়ানক বেগে অজস্র পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহা কে নিরূপণ করিতে পারে? এক একটা ধূমকেতুর আয়তনই বা কেমন বিস্ময়কর! ১৬৮০ ষোল শত আশী খৃষ্টাব্দে যে ধূমকেতুর উদয় হয়, তাহার পুচ্ছ দৈর্ঘ্যে ৫,৪১,২০,০০০ পাঁচ কোটি একচল্লিশ লক্ষ বিংশতি সহস্র ক্রোশ পর্য্যন্ত, এবং ১৮১১ আঠারশ এগার খৃষ্টাব্দে যে ধূমকেতুর উদয় হয়, তাহার পুচ্ছ দৈর্ঘ্যে ২,২৫,২০,০০০ দুই কোটি পঞ্চবিংশতি লক্ষ বিংশতি সহস্র ক্রোশ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। উল্লিখিতরূপ বৃহৎ

* এ পর্য্যন্ত ১৫৭ এক শত সাতান্নটা গ্রহ ও ২৩টা উপগ্রহ অর্থাৎ চন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।

† শনৈশ্চরগ্রহ। ‡ বৃহস্পতিগ্রহ,

বৃহৎ ধূমকেতুসমুদায় এক এক বার সূর্য্যের সমীপবর্ত্তী হয়, পুনর্ব্বার যাবতীয় গ্রহের কক্ষবৃত্ত অতিক্রম করিয়া সীমাশূন্য নভো-মণ্ডলে ভ্রমণ করিতে থাকে। ১৭৬৩ সতর শত তেষট্টি খৃষ্টাব্দে যে ধূমকেতুর উদয় হয়, তাহা সূর্য্যের নিকট হইতে ৬,৮৩,০০,০০,০০০ ছয় শত তিরাশী কোটি ক্রোশ পর্য্যন্ত গমন করে এবং ১৬৮০ ষোল শত আশী খৃষ্টাব্দের ধূমকেতু এতাদৃশ দূরগামী যে, প্রতিঘণ্টায় ৩,৮৭,২০০ তিন লক্ষ সাতাশী সহস্র দুইশত ক্রোশ ভ্রমণ করে, ইহাতেও একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতে ৫৭৫ পাঁচ শত পঁচাত্তর বৎসর অতীত হয়। কোন কোন ধূমকেতু এরূপ পথে পর্য্যটন করে যে, তাহা দেখিয়া জ্যোতির্ব্বেত্তারা বলেন, তাহারা যে আর কখন সূর্য্য-সন্নিধানে প্রত্যাগমন করিবে, এমন বোধ হয় না;—তাহারা গগন-মণ্ডলে প্রচণ্ডবেগে নিরন্তর ধাবমান হইবে, আমাদের নিকট আর কদাচ পুনরাগমন করিবে না। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!!!—উল্কাপিণ্ড গ্রহাদির তুল্য বৃহৎ নয়, * এবং ধূমকেতুর সমান দূরগামীও বোধ হয় না। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। এক এক বারে লক্ষ লক্ষ উল্কাপিণ্ড পৃথিবীতে পতিত হইয়া থাকে। ১৮৩৩ আঠার শত তেত্রিশ খৃষ্টাব্দের ১২ই ও ১৩ই নবেম্বরে আমেরিকার উত্তরখণ্ডে নয় ঘণ্টার মধ্যে অন্যূন ২,৪০,০০০ দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার উল্কা-পিণ্ড পতিত হইয়াছিল। যখন এরূপ শিলা-বর্ষণ সদৃশ প্রচণ্ড উল্কা-বর্ষণ বারংবার প্রত্যক্ষ

* ৪।৫ চারি পাঁচ হাত অপেক্ষায় দীর্ঘতর উল্কা-পিণ্ড প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় নাই। খৃষ্টাব্দের দশম শতাব্দে ইটালির অন্তঃপাতী নার্ণি নগরের নিকটবর্ত্তী এক নদীর উপরে এক বৃহৎ উল্কা-পিণ্ড পতিত হয়, তাহা জলের উপর ২।৩ দুই তিন হাত উচ্চ হইয়াছিল।

হইয়া থাকে, তখন সৌর জগতের কত কোটি উল্কা-পিণ্ড অবিরত উড্ডীয়মান হইতেছে, তাহা কে বলিতে পারে!

সৌর জগতের গ্রহ উপগ্রহাদি যত বৃহৎ বস্তু আছে, সূর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তর। উহা এত বৃহৎ যে, আমাদের অধিষ্ঠান-ভূত ভূ-মণ্ডলের মত ১৪,০০,০০০ চতুর্দ্দশ লক্ষ জীব-লোক উহার গর্ভ-মধ্যে নিবিষ্ট থাকিতে পারে। উহার আয়তন সমুদায় গ্রহের আয়তন-সমষ্টির প্রায় ৬০০ ছয় শত গুণ। যদি সূর্য্যমণ্ডলের অভ্যন্তর খনন করিয়া শূন্য করা যায় এবং ভূ-মণ্ডল তাহার মধ্য স্থানে স্থাপিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে এত স্থান থাকে যে, চন্দ্র-মণ্ডল ভূ-মণ্ডলের কেন্দ্র হইতে এক্ষণে যত অন্তরে অবস্থিত আছে, তাহার অপেক্ষায় আর ৮১,০০০ একাশী সহস্র ক্রোশ অধিক অন্তরে স্থাপিত হইলেও, অনায়াসে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পারে। বিশেষতঃ বিশ্ব-প্রকাশক প্রভাকর চতুর্দ্দিকে গ্রহ উপগ্রহাদিকে তিমিরাবরণ হইতে মুক্ত করিয়া তেজঃ, জ্যোতিঃ ও সৌন্দর্য্য বিতরণপূর্ব্বক যেরূপ প্রভাব প্রকাশ করে, তাহা এক কালে একত্র অনুভব করিতে হইলে, বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। কেবল সূর্য্য মাত্রের বিশাল আয়তন ও প্রবল প্রভাব পর্য্যালোচনা করাই মানবীয় মনের সাধ্যাতীত বোধ হয়, ইহাতে মনের মধ্যে সমস্ত সৌর জগতের সমুদায় ব্যাপার একত্র ধারণ করা কাহার সাধ্য?

এই সমস্ত বিশাল জ্যোতিষ্কের অতি বিস্ময়-কর আয়তন মাত্র পর্য্যালোচনা করিয়াই বা আমরা জগতের মহত্ত্ব ও গাম্ভীর্য্যের বিষয় কি জানিলাম? এই অপরিসীম বিশ্বমধ্যে বিশ্বপতির যেরূপ অচিন্ত্য শক্তি প্রকাশিত রহিয়াছে, ঐ সমস্ত প্রকাণ্ড জড়ময় পিণ্ডের প্রচণ্ড

বেগের বিষয় অনুধাবন করিলেই বা তাহা কি জানা যাইবে? তাহারা যেরূপ প্রবল বেগে পরিভ্রমণ করে, ভূ-মণ্ডলে তাহার অনুরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং তাহা গণনা করিয়া নিরূপণ করিলেও সুস্পষ্ট অনুভব করা যায় না। আমরা অশ্বের গতি, বায়ুর গতি, শরের গতি, এবং বাষ্পীয় পোত ও বাষ্পীয় রথের গতিকে সাতিশয় শীঘ্রগতি বলিয়া উল্লেখ করি। কামান হইতে নিক্ষিপ্ত গোলকের বেগ উল্লিখিত সমুদায় বস্তুর বেগ অপেক্ষা প্রবল। কিন্তু পৃথিব্যাদি গ্রহ, উপগ্রহ ও ধূমকেতুর বেগের সহিত তুলনা করিলে, অশ্বরথাদির গতি কোথায় থাকে? শনৈশ্চর গ্রহ প্রতিঘণ্টায় ৯,৬৮০ নয় সহস্র ছয় শত আশী ক্রোশ, বৃহস্পতি ১২,৭৬০ বার সহস্র সাত শত ষাটি ক্রোশ, পৃথিবী ২৯,৯৩৭ উনত্রিশ সহস্র নয় শত সাঁইত্রিশ ক্রোশ, শুক্র ৩৫,২০০ পঁয়ত্রিশ সহস্র দুই শত ক্রোশ এবং বুধ ৪৮,১১৮ আটচল্লিশ সহস্র একশত আঠার ক্রোশ ভ্রমণ করিয়া থাকে। কামানের গোলা প্রতিঘণ্টায় ঊর্দ্ধসংখ্যা ৩৫২ তিন শ, বায়ান্ন ক্রোশ গমন করে। কিন্তু বুধ গ্রহ তদপেক্ষায় ১৩৬ একশত ছত্রিশ্‌ গুণ প্রবলতর বেগে অবিরত পরিভ্রমণ করিতেছে।

এ প্রকার প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড সমুদায়ের চলিতে পারাই আশ্চর্য্য বোধ হয়। ইহাদের এতাদৃশ প্রচণ্ড বেগ যে, অননুভবনীয় আশ্চর্য্যশক্তি কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়াছে, তাহা কে অনুভব করিতে পারে? কামান দ্বারা নিক্ষিপ্ত যে লৌহগোলক সাতিশয় শীঘ্রগামী বোধ হয়, তাহার ব্যাস কতিপয় অঙ্গুলি অপেক্ষায় অধিক নয়। কিন্তু যে বৃহস্পতি গ্রহের ভয়ঙ্কর বেগের বিষয় ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইল, তাহার গর্ভ-মধ্যে পৃথিবীর তুল্যরূপ বৃহৎপ্রমাণ সহস্রাধিক জীবলোক প্রবিষ্ট থাকিতে পারে। একজন পণ্ডিত গণনা করিয়া লিখিয়াছেন,

যদি মেদিনী এক স্থানে স্থিরীভূত থাকে, আর সৌরজগতের যাবতীয় গ্রহ ও উপ-গ্রহ যদি মনুষ্যের তুল্যরূপ বাহুবল-বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী জীবে পরিপূর্ণ থাকে, এবং তাহা দ্বারা সমবেত হইয়া স্ব স্ব ভুজ-বলে ভূ-মণ্ডল সঞ্চালন করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা পায়, তথাপি উহাকে অঙ্গুলি-প্রমাণ স্থানও চালনা করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু উহা বিশ্বপতির বিশ্ব-জনীন শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া কামান-নিক্ষিপ্ত অতি শীঘ্রগামী লৌহগোলক অপেক্ষা পঞ্চাশীতি গুণ প্রবলতর বেগে সূর্য্য-মণ্ডলের চতুর্দ্দিকে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। এতাদৃশ বিশাল বস্তুর ঈদৃশ ভয়ানক বেগ যে মহীয়সী শক্তিকর্ত্তৃক সমুদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহা হৃদয়মধ্যে ধারণ করা কাহার সাধ্য? পৃথিবী অপেক্ষা ৭৩৫ সাত শত পঁয়ত্রিশ গুণ বৃহত্তর শনৈশ্চর গ্রহ, অত্যদ্ভুত অঙ্গুরীয়-ত্রয় ও চন্দ্রমণ্ডল অপেক্ষা বিশালতর অষ্ট উপগ্রহ সমভিব্যাহারে লইয়া প্রতি ঘণ্টায় ৯,৬৮০ নয় সহস্র ছয় শত আশী ক্রোশ ভ্রমণ করিতেছে, ইহা একবার মনন করিলে বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হইতে হয়। যদি আমরা উক্ত গ্রহের সার্দ্ধ চারিশত ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত হইয়া দেখিতে পাই, তাহা হইলে কেবল ঐ অঙ্গুরীয়-ত্রয়-পরিবেষ্টিত অত্যদ্ভুত জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের দর্শনেই আমাদের দৃষ্টি-ক্ষেত্র পরিপূর্ণ হয়, এবং উহা নভো-মণ্ডলের অর্দ্ধভাগ ব্যাপিয়া অত্যন্ত প্রচণ্ড বেগে উড্ডীয়মান হইতেছে, এইরূপ দৃষ্ট হয়। কিন্তু যখন সূর্য্য-মণ্ডলের বেগের বিষয় বিবেচনা করা যায়, তখন এ চমৎকারই বা কোথায় থাকে! উহা গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু প্রভৃতি সৌরজগতীয় যাবতীয় বস্তু সমভিব্যাহারে লইয়া নভো-মণ্ডলের কোন অপ্রত্যক্ষ স্থান প্রচণ্ড বেগে প্রদক্ষিণ করিতে চলিতেছে; সেই অননুভবনীয়, গাম্ভীর্য্যশালী ভয়ানক ব্যাপার জ্ঞান-নেত্রে প্রত্যক্ষ

করিতে গেলে, সময়ে পরাস্ত হইয়া আসিতে হয়। এতাদৃশ দুর্ব্বোধ ভয়ঙ্কর গম্ভীর ব্যাপার মনেও ধারণা করা যায় না এবং বাক্যেও বর্ণনা করা যায় না। এরূপ বিষয়ের প্রশংসা করিতে হইলে, কেবল বিস্ময়, চমৎকার, আশ্চর্য্য প্রভৃতি অদ্ভুতবোধক শব্দ মাত্র উল্লেখ করিয়া নিরস্ত থাকিতে হয়।

এ পর্য্যন্ত আমরা উল্লিখিত জীবলোক-সমুদায় জীবশূন্য জড়ময় বিবেচনা করিয়া, তাহাদের বর্ণনা করিতেছি। কিন্তু এতাদৃশ বিশাল লোক সকল জীবপূর্ণ সুখ-সম্পন্ন না ভাবিয়া কে নিরস্ত থাকিতে পারে? তৎসমুদায়ও পৃথিবীর ন্যায় বিবিধ জীবের নিবাসভূমি। তাহাতেও অবশ্য অশেষবিধ জীবের অশেষ-প্রকার প্রণালী-ক্রমে বিবিধ প্রকার শারীরিক ও মানসিক ব্যাপার নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। না জানি, তথায় কতবিধ বুদ্ধি-প্রকাশ, প্রেম-বিলাস, আনন্দ-বিকাশ সম্পন্ন হইয়া থাকে! না জানি, আনন্দময় অমৃতময় পুরুষ কোন্ লোকে কত প্রকার অচিন্তনীয়, অনির্ব্বচনীয়, অগণনায় মহিমা প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন! না জানি, করুণাময়ের করুণা-ভাজন সন্তানেরা কোন্ লোকে তাঁহার কিরূপ মহিমা কীর্ত্তন করিয়া জীবন সার্থক করিতেছে।

এখন আমাদের মানস-বিহঙ্গ সৌরজগতের পরিজ্ঞাত ভাগের প্রান্ত পর্য্যন্ত উড্ডীয়মান হইয়াছে। আর তাহাকে ক্ষান্ত রাখা যায় না। তাহার অপরিশ্রান্ত পক্ষ সকল আর নিরস্ত হইবার নয়। অখিল বিশ্বের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, এমন অচিন্ত্য অননুভবনীয় সৌর-জগৎকেও যৎসামান্য ক্ষুদ্র বস্তু বলিয়া বোধ হয়। অগণ্য নক্ষত্র-মণ্ডল তৃণ-ক্ষেত্র-স্থিত তৃণ ও বালুকা-ক্ষেত্র-স্থিত বালুকার ন্যায় অপরিসীম আকাশ-ক্ষেত্রে ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে।

এক এক নক্ষত্র এক এক সূর্য্য এবং বোধ হয়, তাহারা প্রত্যেকে এক এক সৌর-জগতের মধ্যস্থানে অবস্থিত থাকিয়া চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী
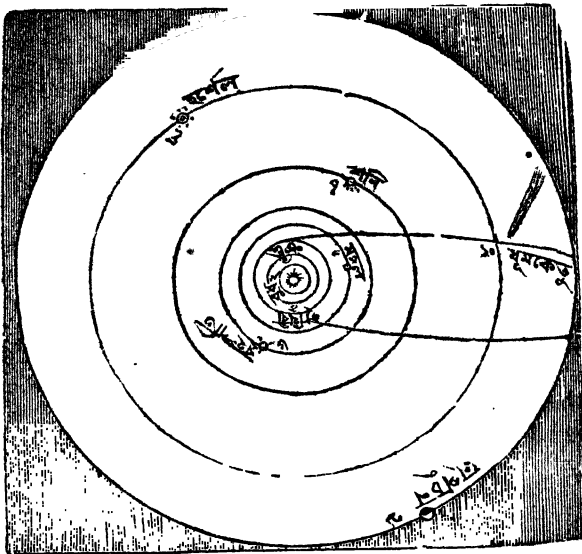
গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতিকে তেজঃ ও জ্যোতিঃ বিতরণ করিতেছে, এবং তত্রত্য জীবজন্তুদিগকে পালন করিয়া সুস্থতা ও স্বচ্ছন্দতা বিধান করিতেছে। ইতিপূর্ব্বে আমরা যেরূপ এক সৌর-জগতের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইতেছিলাম, বিশ্বাধিপের বিশ্বরাজ্য সেরূপ কত সৌর-জগতে পরিপূর্ণ, তাহা এক বার অন্তঃকরণে ধারণ করিতে চেষ্টা কর। তাহাদের সংখ্যাই বা কত, রচনাই বা কিরূপ, কত কত বিচিত্র ব্যাপারই বা তৎসমুদায়ে সম্পন্ন হইতেছে, তাহা কাহারও নিরূপণ করিবার সামর্থ্য নাই বটে, কিন্তু সেই সমস্ত সৌর-জগৎ যে এক সীমাশূন্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী

এক এক প্রদেশ স্বরূপ এবং এক রাজাধিরাজ মহারাজের শুভকর রাজশাসন দ্বারা রক্ষিত ও পালিত, তাহার সন্দেহ নাই।

তিমিরাচ্ছন্ন মেঘশূন্য রজনীর নিশীথ-সময়ে ঊর্দ্ধ দিকে নেত্র নিক্ষেপ করিয়া একেবারে যত নক্ষত্র দৃষ্টি করা যায়, তাহা আমাদের জ্ঞাননেত্রের দৃষ্টিক্ষেত্রে ধারণ করা কঠিন। কিন্তু দূরবীক্ষণ-সহকারে একবারে যত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার তুলনায় নিশীথ-সময়ে নিরীক্ষিত পূর্ব্বোক্ত সমস্ত তারাও অল্পসংখ্যক বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। দূরবীক্ষণ যন্ত্র যত উৎকৃষ্ট ও পরিষ্কৃত হইয়া আসিতেছে, ততই অধিক নক্ষত্র আমাদের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইতেছে। গগনমণ্ডলে যে দক্ষিণোত্তর-ব্যাপিনী শুভ্রবর্ণ রেখা হরিতালী ও ছায়াপথ* বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তাহা কেবল নক্ষত্রে পরিপূর্ণ; অত্যন্ত দূরতা প্রযুক্ত ঐরূপ অতি সূক্ষ্ম শুভ্রবর্ণ নীরদতুল্য প্রতীয়মান হইয়া থাকে। চন্দ্রমণ্ডল নভোমণ্ডলের যৎকিঞ্চিৎ স্থান যাহা ব্যাপিয়া থাকে, হরিতালীর অন্তর্গত তৎপ্রমাণ স্থানে ২,০০০ দুই সহস্র নক্ষত্র দৃষ্ট হয়। উইলিয়ম্ হর্শেল নামক জগদ্বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিৎ একদা আপনার নির্ম্মিত অদ্ভুত দূরবীক্ষণ দ্বারা ছায়াপথের কিয়দংশ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, তাহাতে এক বার ৩৭॥০ সাড়ে সাঁইত্রিশ পলের মধ্যে ১,১৬,০০০ এক লক্ষ, যোড়শ সহস্র নক্ষত্র, এবং অন্য এক বার, ১ এক দণ্ড ৪২॥০ সাড়ে বিয়াল্লিশ পলের মধ্যে ২,৫৮,০০০ দুই লক্ষ অষ্টপঞ্চাশৎ সহস্র নক্ষত্র তাঁহার দূরবীক্ষণের দৃষ্টিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, এক এক নক্ষত্র এক এক

* ইতর ভাষায় ইহাকে যমের জাঙ্গাল কহে।

সূর্য্যস্বরূপ, বরং অনেক নক্ষত্র তদপেক্ষা বৃহত্তর ও তেজস্বিতর! বাস্তবিক, গণনা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, লুব্ধক নামক নক্ষত্র সূর্য্যাপেক্ষা ৩৬ ছত্রিশ গুণ উজ্জ্বল, আমাদের সূর্য্যমণ্ডল এত উজ্জ্বল বটে, তথাচ এ বিষয়ে নিকৃষ্ট নক্ষত্রগণের মধ্যে গণিত করিতে হইল। দীপ-শিখা-সদৃশ প্রতীয়মান ক্ষুদ্র নক্ষত্র-সমুদায় যে এতাদৃশ তেজস্বী, ইহা স্বপ্নের অগোচর ছিল। তাহাদের অসহ্য তেজঃপুঞ্জ অনুভব করা সৃষ্ট জীবের সাধ্য বলিয়া বোধ হয় না। তাহাদের জ্যোতিঃ-সমষ্টি মনন করিতেও যেন চক্ষুর্দ্বয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে।

হীরকখণ্ডবৎ প্রতীয়মান নক্ষত্রগণের সংখ্যা, তেজস্বিতা ও আয়তনের বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইল, কিন্তু তাহাদের দূরস্থতা-বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ না দেখিলে, বিশ্বাধিপের বিশ্ব-রাজ্যের বিশালতা প্রতীতি করা যে আমার উদ্দেশ্য, তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। তাহারা এরূপ দূরবর্ত্তী যে, যে সমস্ত জ্যোতির্ব্বিৎ-কেশরী জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত মুহূর্ত্তমাত্রে বৃহস্পতি, শনি, হর্শেল ও নেপচ্যুন গ্রহের দূরত্ব নিঃসন্দেহ গণনা করিতে পারেন, তাঁহারা বহুকাল পর্য্যন্ত বহুপ্রকার যন্ত্র নিয়োগ দ্বারা বিধিমতে চেষ্টা করিয়াও একটি মাত্র নক্ষত্রেরও দূরত্ব নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হন নাই, কেবল এতাবন্মাত্র অবধারণ করিয়াছিলেন যে, তদুদ্দেশে যে সমস্ত নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষিত হয়, তাহারা কোন ক্রমেই ২২,০০,০০,০০,০০,০০০ দ্বাবিংশতি নিখর্ব্ব যোজনের অপেক্ষা অল্পতর দূরে অধিষ্ঠিত নয়। কিন্তু ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা কোন বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইবার নহেন। সংপ্রতি তাঁহারা অনেক কৌশলে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী ১০।১২ দশ বারটা নক্ষত্রের দূরত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাহা অঙ্ক দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় বটে,

কিন্তু মনোমধ্যে সম্যক্ প্রকারে ধারণ করা অসাধ্য। লুব্ধক তারা ন্যূনাধিক ৪৪,০০,০০,০০,০০,০০০ চতুশ্চত্বারিংশৎ নিখর্ব্ব যোজন এবং ধ্রুবতারা ন্যূনাধিক ২,০১,০০,০০,০০,০০,০০০ দুই শত এক নিখর্ব্ব যোজন অন্তরে অবস্থিত রহিয়াছে। ১৮৫৩ আঠার শত তিপ্পান্ন খৃষ্টাব্দে দুইটি নক্ষত্রের দুরত্ব নির্ণয় হইয়াছে; একটি সপ্তর্ষির অন্তর্গত দ্বিতীয়টি অভিজিৎ নামক নক্ষত্র-ত্রয়ের প্রধান নক্ষত্র। সপ্তর্ষির অন্তবর্ত্তী নক্ষত্র পৃথিবীর নিকট হইতে ১,৪৮,৫০,০০,০০,০০,০০০ এক শত অষ্টচত্বারিংশৎ নিখর্ব্ব পঞ্চ খর্ব্ব যোজন অন্তরে এবং অভিজিতের অন্তর্গত নক্ষত্র ১,৪৩,০০,০০,০০,০০,০০০ একশত ত্রিচত্বারিংশৎ নিখর্ব্ব যোজন অন্তরে অবস্থিত রহিয়াছে। যে জ্যোতিঃ প্রতি পলে ২০,২৭,৫২০ বিংশতি লক্ষ সপ্তবিংশতি সহস্র পাঁচ শত বিংশতি ক্রোশ চলে, উল্লিখিত অভিজিৎ নক্ষত্র হইতে পৃথিবীতে আসিতে তাহার প্রায় একবিংশতি বৎসর অতীত হয়। যদি অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী চক্ষুর্গোচর নক্ষত্র-গণ এরূপ দূরে অধিষ্ঠিত যে, তাহা মনন ও স্মরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে হত-জ্ঞান হইতে হয়, তবে হরিতালীস্থিত যে সমস্ত তারকা-রাজি বাষ্পরাশি-বৎ প্রতীত হয়, অথবা যাহাদিগকে যন্ত্র-সহকার-ব্যতিরেকে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহারা যে কত অন্তরে অবস্থিত, তাহা কে গণনা করিবে? কেই বা তাহা অন্তঃকরণে ধারণা করিতে সাহসী হইবে? তাহাদের দুরত্বের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, বুদ্ধিবৃত্তি বিঘূর্ণিত হইয়া উঠে। জ্যোতির্ব্বিদেরা ইহা সম্পূর্ণ সম্ভবপর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, অনেক অনেক নক্ষত্র-পুঞ্জের আলোক অবনিমণ্ডলে উপনীত হইতে দশ লক্ষ বৎসর অতীত হয়। কিন্তু এই বা কি? যখন আকাশ-মণ্ডল অসীম বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইতেছে, তখন মনোবৎ দ্রুতগামী জ্যোতিঃপদার্থের

দশ লক্ষ বৎসরের পথই বা কত দূর! অনন্ত-স্বরূপের অসীম সাম্রাজ্যের তুলনায় উহাও এক বিন্দু মাত্র।

যাঁহাদিগের জ্যোতির্ব্বিদ্যা পর্য্যালোচনা ও নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করা অভ্যাস নাই, তাঁহারা যাবতীয় নক্ষত্র-মণ্ডলকে সতত সমভাবাক্রান্ত বিবেচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। নিত্য পরিবর্ত্তনই সমুদায় বিশ্বের স্বভাব-সিদ্ধ লক্ষণ। আমরা নরলোক-নিবাসী হইয়াও নক্ষত্রমণ্ডল-সংক্রান্ত যে সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাই, তাহাতেও বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হইতে হয়। কত কত পুরাতন নক্ষত্র একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। কত কত অভিনব নক্ষত্র অকস্মাৎ আকাশ-মণ্ডলে আবির্ভূত হইয়া অবস্থিত রহিয়াছে। আর কতকগুলি আবির্ভূত হইবার পর দুই এক বৎসর দৃষ্টিগোচর থাকিয়া পুনর্ব্বার তিরোহিত হইয়াছে। বহুসংখ্যক তারার তেজস্বিতা যথাক্রমে হ্রাস হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই, পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ বৃদ্ধি পায়। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা কয়েকটি নক্ষত্রের তেজস্বিতা ও পরিবর্ত্তনের ক্রম এপ্রকার নিরূপণ করিয়াছেন যে, প্রায় চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধির ন্যায় উহাদের হ্রাস-বৃদ্ধির সময় ও পরিমাণ গণনা করিতে পারেন। জ্যোতির্ব্বিহীন গ্রহশ্রেণীতে পরিবেষ্টিত থাকাতে, তাহাদের ঐরূপ ঘটনা হওয়া অসঙ্গত নয়। ফলতঃ তদ্ভিন্ন অন্য কোন হেতু আমাদের অনুভবে উপস্থিত হয় না। হে জগদীশ! এ সকল তোমার কীদৃশী মহীয়সী কীর্ত্তি?

গ্রহ, উপগ্রহ ও ধূমকেতুর সহিত তুলনা করিয়া পূর্ব্বতন জ্যোতির্ব্বিদেরা নক্ষত্রগণকে নিতান্ত নিশ্চল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাও যথার্থ হইল না। পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রহাদির গতিবিধি-বিষয়ে বিশ্বাধিপতির যাদৃশ প্রবল শক্তি প্রকাশিত রহিয়াছে, নক্ষত্র

গণের বিষয়েও তাহা সুস্পষ্ট লক্ষিত হইয়াছে। অনেক নক্ষত্র ক্রমশঃ স্থানান্তর হইতেছে, এমন কি, গ্রীশদেশীয় পূর্ব্বকালীন জ্যোতির্ব্বিদেরা নভোমণ্ডলে যে যে স্থানে যে যে উজ্জ্বল নক্ষত্র দৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার একটিও এক্ষণে সে স্থানে অবস্থিত নাই, তদ্ভিন্ন দুই নক্ষত্র পরস্পর পরস্পরের আকর্ষণ-গুণে আকৃষ্ট থাকিয়া, উভয়েই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী এক নির্দ্দিষ্ট স্থানের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, এই ব্যাপার গগনমণ্ডলের সকল ভাগেই প্রত্যক্ষ হয়। এ পর্য্যন্ত এইরূপ ৬৫০ সার্দ্ধ ষট্‌শত নক্ষত্রযুগ নিরূপিত হইয়াছে, এবং তাহাদের পরিভ্রমণের পথ ও সময় নির্দ্ধারণের বিষয় অনেক অবধারিত হইয়াছে। ধ্রুব নক্ষত্র ৩৬৯ তিন শত উনসত্তর বৎসরে এবং উত্তর ভাদ্রপদ-নামক নক্ষত্রদ্বয়ের অন্তর্গত এক নক্ষত্র ১০,৩৭৬ দশ সহস্র তিন শত ছিয়াত্তর বৎসরে এক একবার ঐরূপ পরিভ্রমণ করে। কিন্তু অনেক নক্ষত্রের পরিভ্রমণের কাল ৫০০ পাঁচ শত বৎসরের অধিক নহে। ঐ সমস্ত পরস্পর-সম্বদ্ধ নক্ষত্রযুগল পৃথিবী হইতে দেখিলে পরস্পর অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী দেখায়, কিন্তু সূর্য্য-মণ্ডল মেদিনী-মণ্ডলের নিকট হইতে যত অন্তরে অবস্থিত, তাহারা পরস্পর তদপেক্ষা অধিকতর দূরবর্ত্তী বোধ হয়। বাস্তবিক ঐরূপ এক নক্ষত্রযুগের অন্তর্গত দুই নক্ষত্র পরস্পর ১,১০,০০,০০,০০,০০০ একাদশ খর্ব্ব যোজন অপেক্ষা অধিক অন্তরস্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গতি ও পরিবর্ত্তন কেবল সৌর-জগতেরই ধর্ম্ম নয়, সমুদায় নক্ষত্র-মণ্ডলেই ঐ ব্যাপার লক্ষিত হয়।

আমরা বিশ্বেশ্বরের বিশ্ব-মন্দির যত দূর আরোহণ করি, ততই তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া চমৎকৃত হই, এবং তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অন্ত-নির্দ্ধারণ-বিষয়ে নিরাশ হইতে থাকি। আমাদের মানস-বিহঙ্গ প্রথমে পৃথিবী-মণ্ডল পর্য্যটন-

পূর্ব্বক সৌর-জগৎ সন্দর্শন করিয়া নক্ষত্র-পরিপূর্ণ হরিতালী পর্য্যন্ত উড্ডীয়মান হইয়াছে। অতঃপর আর এক অতি চমৎকারজনক ব্যাপার উপস্থিত! আমরা পূর্ব্বোল্লিখিত হরিতালী প্রভৃতি যাবতীয় নক্ষত্রশ্রেণীতে পরিবেষ্টিত রহিয়াছি, তৎসমুদায়ের ঊর্দ্ধে ও পার্শ্বে বহুদূর পর্য্যন্ত গাঢ়তর ঘনীভূত তিমির-রাশি-ব্যতিরেকে আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। তথায় না সূর্য্য, না নক্ষত্র, না অন্যবিধ কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। দূরবীক্ষণ যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, তথাচ একটি মাত্র রশ্মিও দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবলই পাষাণবৎ দুর্ভেদ্য অন্ধকার মাত্র লক্ষিত হয়। কিন্তু সেই তিমিরাচ্ছন্ন জন-শূন্য গাম্ভীর্য্যশালী নভোভাগ অতিক্রম করিয়া দৃষ্টিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইলে, কোন কোন অতিদূরবর্ত্তী দুর্লক্ষ্য স্থান কুজ্ঝটিকাবৎ প্রতীয়মান হয়। সেই সমুদায় নভঃস্থান কেবল নক্ষত্রপুঞ্জে পরিপূর্ণ; দূরস্থতা প্রযুক্তই কুজ্ঝটিকার মত দেখিতে পাওয়া যায়। সে সমস্ত তারক-স্তবক কতদূরে অবস্থিত, তাহা কে বা গণনা করিবে? কেই বা রচনা করিবে? কেই বা অনুভব করিতে সমর্থ হইবে? সে সকল স্থান আকাশরূপ অপরিসীম সমুদ্রের এক এক দ্বীপ-পুঞ্জ-স্বরূপ। তথা হইতে দৃষ্টি করিলে, আমাদের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পরিদৃশ্যমান নক্ষত্র-সমুদায়ও উল্লিখিতরূপ কুজ্ঝটিকাবৎ বোধ হইবে। আমরা চতুর্দ্দিকে হরিতালী-সংবলিত যাবতীয় নক্ষত্রপুঞ্জে পরিবৃত রহিয়াছি, তাহা যদি এক দ্যুলোক বলিয়া উক্ত হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত কুজ্ঝটিকাবৎ দৃশ্যমান স্থান-সমুদায়ও এক এক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দ্যুলোক বলিয়া উল্লেখ করিতে হইবে। দূরবীক্ষণ-সহকারে এবম্প্রকার সহস্র সহস্র দ্যুলোক দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। আমরা যে অসীম-প্রায় দ্যুলোকের অভ্যন্তরে অবস্থিত রহিয়াছি, ব্রহ্মাণ্ডে এরূপ

কত কোটি দ্যুলোক বিদ্যমান আছে, কে বলিতে পারে? এই সমুদায় পর্য্যালোচনা করিতে করিতে অন্তঃকরণ বিহ্বল হইতেছে, চমৎকৃত ও স্থিরীভূত হইতেছে, আর উড্ডীয়মান হইবার শক্তি নাই। ইহাতেও কি বিশ্বরাজ্যের প্রান্তদেশ উত্তীর্ণ হইতে পারিলাম না! ইহাতেও কি বিশ্বাধিপতির শক্তির সীমা নিরূপণ করিতে সমর্থ হইলাম না! হে মহিমার্ণব মহেশ্বর! তোমার এ কিরূপ অদ্ভুত মহিমা?

জ্ঞান-চক্ষে বিশ্ব-পতির বিশ্ব-রাজ্য কতদূর অবলোকন করা গেল, তাহা একবার অন্তঃকরণের একত্র ধারণ করিতে চেষ্টা করা উচিত। বাস্তবিক, তাহাতে একবার মানস-বলে পরিভ্রমণ না করিয়া কে নিরস্ত হইতে পারে? যদি কেহ কল্পনা-পথে পাদ-পীঠ-স্বরূপ পৃথিবী হইতে পদোত্তোলন-পূর্ব্বক জলনিধির ভয়ঙ্কর তরঙ্গ-শ্রেণী ও আগ্নেয়-গিরির ভয়ানক অগ্নি-জ্বালা দর্শন করিতে করিতে উর্দ্ধপথে উত্থিত হন, তবে তিনি কিঞ্চিৎ উঠিয়া গগনমণ্ডলের সকল ভাগে সমভাবে দৃষ্টি-ক্ষেপ করিতে সমর্থ হইবেন; গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু ও উল্কা-পিণ্ড-সংবলিত সমস্ত সৌর-জগৎ একেবারে তাঁহার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইয়া উঠিবে। কি মেষ, কি বৃষ, কি সিংহ, কি মীন, সমগ্র রাশিচক্র একেবারেই দৃষ্ট হইতে থাকিবে। তিনি ক্রমে ক্রমে উর্দ্ধ-গামী হইয়া প্রচণ্ড সূর্য্য-মণ্ডল সমীপবর্ত্তী দেখিয়া চকিত হইয়া উঠিবেন! কিন্তু কোন্ নর তথায় এক নিমিষও তিষ্ঠিতে পারে? তিনি তাহার দুর্ব্বিষহ তেজঃপুঞ্জে অসহমান হইয়া সৌর-জগতের প্রান্তদেশ দর্শনার্থ উত্থিত হইবেন। মঙ্গল-গ্রহের লোহিত প্রভা, বৃহস্পতির চারি চন্দ্র, শনৈশ্চরের অষ্টচন্দ্র ও ভয়ঙ্কর অঙ্গুরীয়ক ইত্যাদি অশেষবিধ অদ্ভুত বিষয় দর্শন করিতে করিতে,

চন্দ্র-দ্বয়-সহকৃত নেপচ্যুন্ নামক অপূর্ব্ব ভুবনে উপস্থিত হইয়া আনন্দ-রসে আর্দ্র হইবেন, এবং দেখিবেন, আমাদের সৌর-জগৎ অধোদিকে পতিত হইয়া রহিল বটে, কিন্তু চতুর্দ্দিকে, এতাদৃশ, এতদপেক্ষা বৃহত্তর ও তেজস্বিতর কত সূর্য্য ও কত সৌর-জগৎ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। কৌতুকদর্শী পরিব্রাজক যেমন গ্রাম, নগর, বন, উপবনাদি নিরীক্ষণ করিতে করিতে পর্য্যটন করে, তিনি সেইরূপ কৌতূহলাবিষ্ট সমুৎসুক হৃদয়ে শ্বেত, পীত, নীল, লোহিতাদি বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট বহুবিধ নক্ষত্র-গহনের মধ্য দিয়া পরিভ্রমণ করিতে করিতে হরিতালীতে উপনীত হইয়া দেখিবেন, হরিতালী কেবল সূর্য্য ও সৌর-জগতে পরিপূর্ণ। হরিতালীর পৃষ্ঠ-দেশে দণ্ডায়মান হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, প্রগাঢ়তর তিমির-সিন্ধু পারে দক্ষিণে-বামে ও ঊর্দ্ধ দিকে, অতি দূরবর্ত্তী প্রদেশে ভূরি ভূরি দুর্লক্ষণীয় দ্যুলোক দর্শন করিবেন, এবং দর্শন করিলেই, তথায় বিচরণার্থ ব্যাকুল-চিত্তে ঊর্দ্ধপথে ধাবমান হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার এইরূপ ধাবমান হইবার সময়ে, আমাদিগের এতাদৃশ জ্যোতিঃপূর্ণ, সুবিস্তৃত, দ্যুলোক ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া কিঞ্চিৎ কুজ্ঝটিকাবৎ অস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে থাকিবে; কোথায় বা আমাদের পৃথিবী, কোথায় বা চন্দ্র, কোথায় বা গ্রহমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত প্রকাণ্ড সূর্য্য-মণ্ডল! তিনি তথা হইতে, এক গ্রহের সহিত অন্য গ্রহের এবং এক সূর্য্যের সহিত অন্য সূর্য্যের বিশেষ করিতে অসমর্থ হইবেন এবং তৎ-সমুদায়কে সমুদ্রতীরস্থ বালুকাকণা অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর বলিয়া বোধ করিবেন। তৎসমুদায় একেবারে অলক্ষিত হইয়া যাইবে; এই স্থলে নিরস্ত হওয়া শ্রেয়ঃকল্প! আমা-দের আর অধিক আরোহণ করিবার অধিকার নাই।

নরলোকে এমন জীব কে আছে যে, এই অসীমাকার বিশ্ব-ব্যাপার অনুভব করিয়া, চিন্তা ও বিবেচনার আয়ত্ত করিতে পারে? ইতিপূর্ব্বে বিশ্বাধিপতির বিশ্বব্যাপিনী ঐশী শক্তিব পরিমাণ-বিষয়ে গ্রহ-নক্ষত্রাদির দূরত্ব ও বেগত্ব-বোধক যে সমস্ত সংখ্যা-বাচক শব্দ নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, তাহা মনের মধ্যে ধারণ করা, মনুষ্যের সাধ্য নয়। সে সমুদায় যাঁহার কার্য্য, তাঁহারই সাধ্য। ঈশ্বরের কার্য্য ঈশ্বর-ব্যতিরেকে অন্য কে ধারণ করিতে পারে? কিন্তু ঐ সমস্ত অঙ্ক-নির্দ্দেশ দ্বারা অচিন্ত্য-স্বরূপের অচিন্ত্য-শক্তির সীমা নিরূপিত হইল, ইহা যেন কাহারও হৃদয়স্থ না হয়। তাঁহার আশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় শক্তি যে আমাদের মনোবৃত্তির ন্যায় সীমাবচ্ছিন্ন নয়, ইহাই অবধারিত হইল। স্থান শক্তি ও কৌশল-নির্দ্দেশক যে সমস্ত সংখ্যা-বাচক শব্দ আমাদের বুদ্ধি-গম্য হইবার নয়, তাহা তাঁহার পক্ষে সাতিশয় সহজ ও সুগম। নর-লোকেও যে বিষয় অনুভব করা এক জনের পক্ষে অসাধ্য, তাহা অন্যের নিকট অতি সহজ। যে শিশু ৪ চারি অপেক্ষায় অধিক, যে বর্ব্বর ৫ পাঁচ অপেক্ষায় অধিক অঙ্ক গণনা করিতে সমর্থ নয়, লক্ষ ও কোটি গণনা করা তাহার অসাধ্য ও অসম্ভাবিত বোধ হয়। কিন্তু কিঞ্চিৎ বোধাধিক্য হইলেই, ঐ সমুদায় অঙ্ক অনায়াসে অনুভূত ও বুদ্ধিবৃত্তির আয়ত্ত হইতে পারে। যখন একপ্রকার জীবের একরূপ মনোবৃত্তির কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক্য সঙ্ঘটন দ্বারা বোধশক্তির এতাদৃশ ইতর-বিশেষ হয়, তখন যে অচিন্তনীয় পুরুষের অচিন্ত্য জ্ঞান ও অনির্ব্বচনীয় শক্তি কোন বিষয়েই আমাদের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির স্বভাবাক্রান্ত নয়, প্রত্যুত তদপেক্ষা অনন্তগুণে উৎকৃষ্ট ও অশেষ বিষয়ে ভিন্নভাবাক্রান্ত, তাঁহার কার্য্য যে আমাদের বোধাতিরিক্ত

ও বিস্ময়-জনক বলিয়া প্রত্যয় জন্মিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? স্থান, কাল ও সংখ্যা তাঁহার কার্য্যের ব্যবচ্ছেদ করিতে পারে না। বিশ্বাধিপতির শক্তি, কৌশল ও কুশলাভিপ্রায় বিশ্ব-রাজ্যের সর্ব্বাংশে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, তাহাতে আর সংশয় হইবার বিষয় নাই; কিন্তু ঐ সকল গুণের সীমা নিরূপণ করা মানবীয় বুদ্ধির সাধ্য নয়। বিশাল বিশ্ব-ব্যাপার অবলোকন করিয়া, বিশ্বেশ্বরের ঐ সমস্ত গুণ অত্যন্ত অধিক প্রমাণ বলিয়া নিশ্চিত প্রতীত হয়; কিন্তু কত অধিক, তাহা কে নিরূপণ করিবে? আমাদের মনোবিহঙ্গ যতই উড্ডীয়মান হউক, তাঁহার মহীয়ান্ মহিমাচলের শিখর-দেশে উত্থিত হইতে সমর্থ হইবার বিষয় কি? কেবল পরাস্ত হইয়া বারংবার প্রত্যাগমন করিয়া নিরস্ত হয়।

আমরা তাঁহার গুণ ও কার্য্যের সীমা নির্দ্ধারণে সমর্থ নহি বলিয়া, তদ্বিষয়ের আলোচনায় নিবৃত্ত হওয়া, কোন ক্রমেই শ্রেয়ঃকল্প নয়। আমরা তাঁহার গুণ-গ্রাম যত দূর নিরূপণ করিতে পারিব, আমাদের মানব-জন্ম গ্রহণ করা তত দূর সার্থক হইবে। যদি আমাদের স্বকীয় সৌর-জগতের অন্তর্গত অতি বিশাল সূর্য্য অবধি অতি ক্ষুদ্র কীটাণু পর্য্যন্ত যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু একত্র অন্তঃকরণে ধারণ করা যায় এবং দৃষ্টাদৃষ্ট সমুদায় নক্ষত্র-মণ্ডল প্রত্যেকে যদি এইরূপ সজীব নির্জীব অসংখ্য বস্তু-বিশিষ্ট এক এক সৌর-জগতের মধ্যস্থিত বলিয়া বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে, বিশ্বরাজ্যের বিশালত্ব ও মহত্ত্ব কতক অনুভূত হইতে পারে। এক অদ্বিতীয় অনির্দ্দেশ্য পুরুষ ভূরিসংখ্যক দ্যুলোক ও সংখ্যাশূন্য সৌর-জগৎ-সংবলিত বিশাল বিশ্বের স্রষ্টা, পাতা, বিধাতা—ইহা যখন স্মরণ-পথে সমারূঢ় হয়, তখন সেই অচিন্ত্য-স্বরূপের অচিন্ত্যশক্তির পরিমাণ কিঞ্চিৎ প্রতীত

হইতে থাকে। তাঁহার মহীয়সী শক্তির এক প্রকার পরিমাণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ; ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুতেই ঐ অননুভবনীয় পূজনীয় শক্তির সুস্পষ্ট নিদর্শন লক্ষিত হইতেছে।

তাঁহার জ্ঞানরূপ বিভাকর-জ্যোতিও আমাদের বুদ্ধি-নেত্রে সহ্য হয় না। জ্যোতিষ, রসায়ন, ভূ-তত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রের সুপণ্ডিত অধ্যাপকেরা বিশ্ব-মধ্যে বিশ্বাধিপতির যে সমস্ত পরমাশ্চর্য্য কৌশল নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা যখন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায়, এবং যখন বিবেচনা করা যায়, আমরা এত পর্য্যালোচনা করিয়াও জগৎপ্রণালীর কোটি কোটি অংশের একাংশও জানিতে পারিলাম না, তখন আমরা তাঁহার বিশ্বব্যাপী জ্ঞান ও নৈপুণ্য প্রতীতি করিতে সমর্থ হই না বটে, কিন্তু তাঁহার অত্যদ্ভুত বিশাল কৌশলের ভাব ও প্রকার কিঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারি এবং তিনি এক এক কৌশল সম্পাদনের নিমিত্ত যেরূপ প্রচুর ও প্রশস্ত উপায় নিয়োজিত করিয়াছেন, তাহার অনুভব করিতে সমর্থ হই। কিন্তু নর-লোক-নিবাসী হইয়া, তাঁহার অচিন্ত্য ও আশ্চর্য্য কৌশল সম্যগ্-রূপে ধারণ করিবার অভিলাষ করা অর্ব্বাচীনতার কর্ম্ম।

বিশ্ব-নিয়ন্তা যদর্থে এই মহীয়সী শক্তি ও অনির্ব্বচনীয় জ্ঞান নিয়োজন করিয়াছেন, তাহা সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, পরম পরিশুদ্ধ প্রীতি-রসে অভিষিক্ত হইতে হয়। কেবল জ্ঞান ও শক্তি থাকিলেই যে তিনি আমাদের পূজার পাত্র ও প্রীতির আস্পদ হইতে পারিতেন, এমন নয়। জ্ঞান ও শক্তি সৎ অসৎ উভয়বিধ বিষয়েই নিয়োজিত হইতে পারে; কিন্তু তিনি আপনার জ্ঞান ও শক্তিকে কেবল কল্যাণ সাধনার্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। বিশ্বের শুভ-

সম্পাদনই বিশ্ব-বিধাতার সমস্ত বিধানের প্রয়োজন। অসংখ্য জীবের জীবন-রক্ষা, শারীরিক ও মানসিক শক্তি-সমুন্নতি এবং সুখ-সম্ভোগ-সংবর্দ্ধনই তাঁহার সকল কৌশলের উদ্দেশ্য! পূর্ব্বোল্লিখিত সমুদায় সৌর-জগতের সমস্ত জীবের কল্যাণ-সাধনই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমুদায় নিয়মের প্রয়োজন। তাঁহার করুণা বিশ্বব্যাপিনী।

সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের সুখের তারতম্য।

জ্ঞানের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! বিদ্যার কি মনোহর মূর্ত্তি! বিদ্যাহীন মনুষ্য মনুষ্যই নয়। বিদ্যাহীন মনের গৌরব নাই। মানব-জাতি পশু-জাতি অপেক্ষায় যত উৎকৃষ্ট, জ্ঞান-জনিত বিশুদ্ধ সুখ ইন্দ্রিয়-জনিত সামান্য সুখ অপেক্ষা তত উৎকৃষ্ট। পৌর্ণমাসীর সুধাময়ী শুক্লযামিনীর সহিত অমাবস্যার তামসী নিশার যেরূপ প্রভেদ, সুশিক্ষিত ব্যক্তির বিদ্যালোক-সম্পন্ন সুচারু চিত্ত-প্রাসাদের সহিত অশিক্ষিত ব্যক্তির অজ্ঞান-তিমিরাবৃত হৃদয়-কুটীরের সেইরূপ প্রভেদ প্রতীয়মান হয়। অশিক্ষিত ব্যক্তি নিকৃষ্ট সুখে ও নিকৃষ্ট কার্য্যে নিবৃত্ত থাকিয়া, নিকৃষ্ট সুখাধিকারী নিকৃষ্ট জীবের মধ্যে গণনীয় হয়, সুশিক্ষিত ব্যক্তি জ্ঞান-জনিত ও ধর্ম্মোৎপাদ্য পরিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগ করিয়া, আপনাকে ভূ-লোক অপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর ভুবনাধিবাসের উপযুক্ত করিতে থাকেন। এই উভয়ের মনের অবস্থা ও সুখের তারতম্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, উভয়কে এক-জাতীয় প্রাণী বলিয়া প্রত্যয় হওয়া সুকঠিন।

অশিক্ষিত ব্যক্তির অন্তঃকরণ আবাল-বার্দ্ধক্য প্রায় অধম কর্ম্মে

নিযুক্ত থাকে। তাহাকে উদরান্ন আহরণার্থ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি পরিচালনপূর্ব্বক শারীরিক পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইতে হয়; কিন্তু তাহার প্রধান মনোবৃত্তি-সমুদায় চির-নিদ্রায় নিদ্রিত থাকিয়া, অথবা অযথাবিধানে পরিচালিত হইয়া, অকর্ম্মণ্য ও দোষান্বিত হইতে থাকে। জীবিকা-সংক্রান্ত কার্য্যই তাহার পক্ষে প্রধান কার্য্য, এবং প্রায়ই বর্ত্তমান কাল ও সন্নিহিত বিষয় মাত্র তাহার আলোচনার বিষয়। এরূপ ব্যক্তি স্বদেশ-ব্যতিরিক্ত সর্ব্ব দেশের সকল বিষয়েই প্রায় অনভিজ্ঞ। হয়ত, অবনিমণ্ডলকেই অসীম বলিয়া বিশ্বাস করে। পৃথিবীর আকৃতি কি প্রকার ও আয়তন বা কত, তাহার জল-স্থলের অবস্থাই বা কীদৃশ, তাহার অন্তঃপাতী কোন্ দেশের কিরূপ শোভা, কোন্ দেশে কিরূপ লোকের অধিবাস, তাহাদিগের আচার ব্যবহার এবং ধর্ম্ম ও রাজনীতিই বা কি প্রকার, নদ, হ্রদ, সমুদ্র, সরোবর, দ্বীপ, প্রায়োদ্বীপাদিই বা কিরূপ ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপিত, এবং কিয়দ্ গুণাবলম্বী কত প্রকার ভূ-চর, খে-চর ও জলচর প্রাণীতেই বা পরিপূর্ণ, এ সকল বিষয়ে সে ব্যক্তি বন-চারী সিংহ ও শাখারূঢ় বিহঙ্গ অপেক্ষায় অধিক অভিজ্ঞ নয়। মানব-সমাজ কীদৃশ সামাজিক নিয়মে নিয়মিত হইতেছে, পূর্ব্বাবধি পৃথিবীতে সংগ্রাম-সঙ্ঘটন, ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তন, রাজ্য-বিপ্লব-সংঘটন প্রভৃতি কত মহানর্থকর ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়া আসিয়াছে, এবং মানব-জাতি বিজ্ঞানের কিরূপ প্রভাব ও শিল্পকার্য্যের কিরূপ উন্নতি সম্পাদন করিয়া, উত্তরোত্তর অলক্ষিত-পূর্ব্ব অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি-সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, সে ব্যক্তি তাহার কিছুই অবগত নয়। সে স্বকীয় নিবাস-ভূমি ভূমণ্ডলের বিষয়ে যেমন অজ্ঞ, অপরিসীম গগন-মণ্ডলের বিষয়ে তদপেক্ষা অধিক। পৃথিবীর অপেক্ষায় বহু সহস্র ও বহু লক্ষ গুণ বৃহত্তর যে সমস্ত জ্যোতিষ্মান্

মণ্ডল নভোমণ্ডলে প্রচণ্ড-বেগে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহার বিষয় কিছুই জ্ঞাত নয়। তৎসমুদায় জানিবার নিমিত্ত তাহার অন্তঃকরণে একবার মাত্রও কৌতূহল-শিখা উদ্দীপ্ত হয় না। দীপ-শিখা-সদৃশ প্রতীয়মান নক্ষত্র-সমুদায় ক্ষুদ্র হউক আর বৃহৎ হউক, দূরস্থ হউক আর সমীপস্থ হউক, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা তাহার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়। এ সকল বিষয়ে তাহার ভ্রূ-ক্ষেপও নাই। বিশ্বপতির বিশ্ব-রচনা-সংক্রান্ত যে সমস্ত পরম আশ্চর্য্য বিষয় নিরূপিত হইয়াছে, যে সমস্ত পরম কল্যাণকর প্রাকৃতিক নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এবং যাবতীয় প্রাকৃতিক বিস্তার যাদৃশী শ্রী-বৃদ্ধি হইয়াছে, ও কি ভৌতিক, কি শারীরিক, কি মানসিক, সর্ব্বশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় যে সমস্ত অভিনব তত্ত্ব দিন দিন উদ্ভাবিত হইয়া, বিশ্ববিধাতার যশঃসৌরভ বিস্তার করিতেছে, সে সমুদায় সে ব্যক্তির গোচর ও হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা নাই। নৈসর্গিক বস্তু ও নৈসর্গিক নিয়মের অনুশীলনে যে কিরূপ অত্যাশ্চর্য্য আনন্দের অনুভব হয়, সে জন্মাবচ্ছিন্নে তাহার স্বাদগ্রহণ-করণে সমর্থ হয় না। সুশিক্ষিত ব্যক্তি বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত ও বর্দ্ধিত করিয়া, পরম পবিত্র সুখার্দ্র-হৃদয়ে যেরূপ পরমাদ্ভুত পরিশুদ্ধ জ্ঞানারণ্যে বিচরণ করেন, অশিক্ষিত ব্যক্তি স্বপ্নেও একবার তথায় পদার্পণ করিতে পারগ হয় না। সে ব্যক্তি বিদ্যা-মন্দিরের দ্বারস্বরূপ ব্যাকরণ-বিদ্যাকেই যথার্থ বিদ্যা বোধ করে; জন্মপত্রিকা রচনা ও শুভাশুভ দিন ক্ষণ গণনাকেই প্রকৃত জ্যোতির্ব্বিদ্যা বলিয়াই প্রত্যয় করে, অশৌচ-ব্যবস্থা ও প্রায়শ্চিত্ত-বিধানকেই বাস্তবিক ধর্ম্মোপদেশ বলিয়া বিবেচনা করে এবং মনঃকল্পিত পৌরাণিক ইতিহাসকেই ভূলোকের যথার্থ ইতিহাস বলিয়া প্রত্যয় করে। স্বদেশীয় শাস্ত্রে যে বিষয়ে যেরূপ

নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং স্বদেশ-মধ্যে যে কার্য্যে যেরূপ রীতি প্রচলিত আছে, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করে। পিতৃপিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষেরা যে প্রাচীন পথ অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন, তাহাই সেই ব্যক্তির মতে সর্ব্বোত্তম। তাহা নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ ও একান্ত অসঙ্গত হইলেও, তাহার অভিপ্রায় পরিবর্ত্তনসহ নয়। স্বজাতির দোষ-দর্শন ও অপর জাতির গুণাবলোকন-বিষয়ে তাহার নিমীলিত নেত্র উন্মীলিত হইবার নয়। তাহার মতানুসারে আমাদের বুদ্ধিরও আর উন্নতি হইবে না, বিদ্যারও আর উন্নতি হইবে না, ধর্ম্মেরও আর উন্নতি হইবে না, সুখেরও আর উন্নতি হইবে না। তাহার অভিপ্রায় এই, আমরা সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, অতএব উত্তরোত্তর অধোগতি প্রাপ্ত হইতে থাকিব।

করুণাময় পরমেশ্বর বিশ্বরাজ্য পরিপালনার্থ যে সমস্ত মঙ্গলময় নিয়ম সংস্থাপন করিয়া, সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন, অশিক্ষিত ব্যক্তি সে সমুদায় অবগত নয়। তাহার অজ্ঞানাবৃত অন্তঃকরণ সর্ব্বস্থানেই নানা বিভীষিকা কল্পনা করে। ভূত, প্রেত, পিশাচ ইত্যাদি অবাস্তবিক পদার্থ তাহার হৃদয়-ক্ষেত্রে নিরন্তর বিচরণ করে। সে ব্যক্তি সদাই শঙ্কিত, নিয়তই উৎকণ্ঠিত, কতপ্রকার কুসংস্কার-পাশে বদ্ধ হইয়া থাকে। শুভাশুভ দিন ক্ষণ তাহার কতই আশঙ্কা ও কতই উদ্বেগ উৎপাদন করে। বিহঙ্গ-বিশেষের স্বর-বিশেষই বা কত ত্রাস ও কত উৎকণ্ঠা উপস্থিত করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমস্ত অসত্য বিষয়ে তাহার যেরূপ বিশ্বাস আছে, তাহা কদাচ বিচলিত হইবার নয়; কিন্তু বিজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা যে সমস্ত যথার্থ বিষয় নিরূপিত হইয়াছে, ও যে সকল অভিনব তত্ত্ব উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাতে তাহার প্রত্যয় জন্মান সুকঠিন কর্ম্ম। লঙ্কাদ্বীপ

মনুষ্যের নিবাস-ভূমি ও সকলেরই গম্য স্থান, ভূ-মণ্ডলের যে ভাগে আমাদিগের বাস, তাহার বিপরীত ভাগেও অন্য লোকের বসতি আছে, অবনি-মণ্ডল শূন্যেতেই অবস্থিত, জন্তুবিশেষ বা বস্তুবিশেষের উপর অধিষ্ঠিত নয়, পৃথিবীর স্থল-ভাগ জলময় সমুদ্রে পরিবেষ্টিত বটে, কিন্তু ক্ষীর-সমুদ্র, সুরা-সমুদ্র, ইক্ষু-সমুদ্র প্রভৃতি পুরাণোক্ত সপ্ত-সমুদ্রের অস্তিত্ব-ঘটিত যত উপাখ্যান প্রচলিত আছে, সর্ব্বৈব মিথ্যা; চন্দ্র সজীব পদার্থ নয়, এবং নিজে তেজোময় নয়, উহার উপর সূর্য্যের আলোক পতিত হয় বলিয়া, তেজোময় বোধ হয়, চন্দ্রমণ্ডলের যে সমস্ত কলঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হরিণ-শিশু নয়, অত্যন্ত গভীর গহ্বর, সেই সকল গহ্বরে সূর্য্যের রশ্মি প্রবেশ করিতে পারে না; সূর্য্যমণ্ডল ভূ-মণ্ডল অপেক্ষায় ১৪,০০,০০০, চৌদ্দ লক্ষ গুণ বৃহৎ, রথোপরি স্থাপিত নয়, অশ্বকর্ত্তৃকও আকৃষ্ট হয় না; সূর্য্যকে যে প্রতিদিন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে দেখা যায়, তাহা বাস্তবিক সূর্য্যের গতি নয়, পৃথিবী নিয়ত ঘূর্ণিত হইতেছে, এই নিমিত্ত সূর্য্যের ঐরূপ গতি প্রতীয়মান হয়, সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে না, পৃথিবী প্রতিঘণ্টায় প্রায় ত্রিশ সহস্র ক্রোশ ভ্রমণ করিয়া এক বৎসরে একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে, ইত্যাদি অবধারিত তত্ত্ব-সমুদায় অশিক্ষিত ব্যক্তির হৃদয়ঙ্গম হওয়া অসাধ্য বোধ হয়। এই সমস্ত বিষয় অবাস্তবিক উপন্যাস অপেক্ষাও তাহার অসম্ভব বোধ হয়। তাহার অন্তঃকরণ ঘোরতর অজ্ঞান-তিমিরে এরূপ আচ্ছন্ন রহিয়াছে, জ্ঞানোৎপাদ্য পরমাদ্ভুত বিশুদ্ধ সুখসম্ভোগে তাহার অধিকার হইবার বিষয় কি? বিশ্বপতির বিশ্বরচনা-মধ্যে তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি, আশ্চর্য্য কৌশল, অপার মহিমা ও অত্যন্ত করুণার অসংখ্য নিদর্শন দর্শন করিয়া, পরমেশ্বর-পরায়ণ জ্ঞানবান্ ব্যক্তির হৃদয়মধ্যে যেরূপ চমৎকার-সংবলিত আনন্দ-রসের সঞ্চার হয়,

অশিক্ষিত অজ্ঞানাবৃত ব্যক্তির সে রসের স্বাদ-গ্রহে সমর্থ হইবার সম্ভাবনা কি ?

কিন্তু সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র ব্যক্তির প্রশস্ত হৃদয় পরম পরিশুদ্ধ বিদ্যালোক লাভ করিয়া কি অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় শোভায় শোভিত হইয়া থাকে! তাঁহার অন্তঃকরণ অকারণে শঙ্কিত ও সঙ্কুচিত হইবার নয়; তিনি বিশ্ব-পতির বিশ্ব-রাজ্যের কৌশল-চক্রের মর্ম্মাবধারণ করিয়া, তদীয় কার্য্য-প্রণালী অসংশয়িত-চিত্তে সুস্পষ্ট দেখিতে পান। তিনি ভৌতিক, শারীরিক, মানসিক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নিয়মের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য নির্দ্ধারণ করিয়া, যে কার্য্যের যে কারণ, তাহা সুন্দর রূপে অবগত হইয়া, অকুণ্ঠিতহৃদয়ে সুখে কালহরণ করেন; তিনি আর দেব-বিশেষকে রোগবিশেষের অধিপতি বলিয়া প্রত্যয় করেন না, মানব-দেহকে প্রেতবিশেষের আশ্রয় বলিয়া বিশ্বাস করেন না, ব্যক্তি-বিশেষের অভিসম্পাতকে অপর ব্যক্তির অনিষ্টাপাতের হেতু বলিয়া স্বীকার করেন না, এবং অগ্নি-দীপন, বারি-বর্ষণ ও বায়ু-সঞ্চারণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধিষ্ঠাত্রীও কল্পনা করেন না। ঐ সমস্ত কার্য্য পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন-প্রকার নিয়মানুসারেই সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং সেই সকল নিয়ম জগতের কল্যাণ মাত্র সাধনার্থেই তাঁহাকর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে, ইহা দেদীপ্যমান দেখিয়া, অসঙ্কুচিত-চিত্তে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। অকারণ উৎকণ্ঠা, অমূলক আশঙ্কা, তাঁহার অন্তঃকরণ স্পর্শ করিতে পারে না। প্রসাদরূপ পবিত্র সমীরণ তাঁহার চিত্তে সতত সঞ্চরণ করিতে থাকে।

এতাদৃশ বিদ্যালোক-সম্পন্ন সুশিক্ষিত ব্যক্তির অন্তঃকরণ অসংখ্য বিষয়ের অসংখ্য ভাবে নিরন্তর পরিপূর্ণ। যে সমস্ত অদ্ভুত বিষয় ও মনোহর ব্যাপার তাঁহার বোধ-নেত্রের গোচর থাকে, তাহা জানিয়া দেখিলে বোধ হয়, তিনি নর-লোক-নিবাসী হইয়াও, কোন চমৎকার-ময়

সুচারু স্বর্গ-লোকে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার অন্তঃকরণে নিরন্তর যে সকল ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা অশিক্ষিত লোকের কদাচ অনুভূত হইবার বিষয় নয়। তিনি আপনার মানস-নেত্রে এককালে সমগ্র ভূ-মণ্ডল পর্য্যবলোকন করিতে পারেন। মহার্ণব-পরিবৃত স্থলভাগ, সমুদ্রস্থিত দ্বীপ-পুঞ্জ, চতুর্দ্দিগ্‌বাহিনী নদী ও উপনদী, স্থানে স্থানে নীরদ-ধারিণী পর্ব্বত-শ্রেণী, কন্দর ও ভৃগু দেশ, শৃঙ্গ ও প্রস্রবণ, মহারণ্য ও মরুভূমি, জল-প্রপাত, উষ্ণ প্রস্রবণ, তুষার-শৈল, তুষার-দ্বীপ, গন্ধক-দ্বীপ, প্রবাল-দ্বীপ ইত্যাদি ভূ-তলস্থ সমস্ত পদার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া পুলকিত হইতে পারেন। তিনি কল্পনা-পথ অবলম্বন করিয়া, অগ্নিময় আগ্নেয়-গিরির শৃঙ্গ-দেশে আরোহণ করিতে পারেন, তৎসংক্রান্ত ভূগর্ভ-বিনির্গত গভীর গর্জ্জন শ্রবণ করিতে পারেন এবং তদীয় শিখর-দেশ হইতে অগ্নিময়ী নদীস্বরূপ ধাতু-নিঃস্রব নির্গত হইয়া, চতুর্দ্দিক্ দগ্ধ করিতে দৃষ্টি করিতে পারেন; তিনি মানস-পথে পর্য্যটন-পূর্ব্বক হিমগিরি-শিখরে উত্থিত হইয়া, নতনয়নে নিরীক্ষণ করিতে পারেন, আপনার চরণতলে বিদ্যুল্লতা জ্বলিত হইতেছে, মেঘাবলি ধ্বনিত হইতেছে, জলপ্রপাত ত্বরিত হইতেছে এবং প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত উৎপন্ন হইয়া, অরণ্য-সমুদায় উৎপাটন করিতেছে ও সমুদ্র-সলিলে করালতম কল্লোল কোলাহল উৎপাদিত করিয়া, ত্রাস ও সঙ্কট উপস্থিত করিতেছে। সর্ব্বকালের সমস্ত ঘটনাই তাঁহার অন্তঃকরণে জাগরূক রহিয়াছে। তিনি মনে মনে কত রাজ্য, ও রাজার সংসার দেখেন, কত বীর ও বিগ্রহের বিষয় বর্ণন করেন এবং কত স্থানের কত প্রকার রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির পরিবর্ত্তন পর্য্যালোচনা করিয়া সুখী থাকেন। যে সময়ে তিনি মিত্রগণের সহিত সহবাস ও সদালাপ করেন, তখন দেশ-বিদেশের জল, বায়ু, শীত, গ্রীষ্ম, গ্রাম, নগর,

আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, শাসন, বিদ্যা, ব্যবসায়, সুখ, সভ্যতা, পশু, পক্ষী, উদ্ভিদ্, ধাতু প্রভৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া, পুলকে পরিপূর্ণ হইতে থাকেন। যে সময়ে তিনি গ্রাম ও গহন ভ্রমণ করেন, তখন বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদির কেবল পরমাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন না, তাহাদের মূল, স্কন্ধ, শাখা, পত্র, পুষ্প, ফলাদির অভ্যন্তরে কীদৃশ কৌশল বিদ্যমান রহিয়াছে ও কত প্রকার আশ্চর্য্য ক্রিয়াই বা নির্ব্বাহিত হইতেছে, উদ্ভিদের মধ্যে কোন্ কোন্ জাতি কি কারণে কোন্ শ্রেণীতে বিনিবিষ্ট হইয়াছে, এবং কোন্ জাতি দ্বারা কিরূপ উপকারই বা উৎপন্ন হইতে পারে, তৎসমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া চমৎকার-সংবলিত সুখামৃতরসে অভিষিক্ত হন, এবং প্রত্যেক বিষয়ের অনুশীলন করিবার সময়ে করুণাময় পরমেশ্বরের পরমাদ্ভুত কৌশল প্রতীতি করিয়া, কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে মনের সহিত ধন্যবাদ করেন। যে তিমিরাচ্ছন্ন নিশীথ-সময়ে অজ্ঞ লোকেরা অশেষবিধ বিভীষিকা ভাবনা করিয়া ভীত হইতে থাকে, সে সময় তিনি নিভৃত স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক গগন-মণ্ডলে নয়নদ্বয় নিয়োজন করিয়া, অসীম বিশ্ব-ব্যাপারের অনুশীলনে অনুরক্ত হইতে পারেন। আমরা যে প্রকাণ্ড ভূমি-খণ্ডের উপর অধিষ্ঠিত রহিয়াছি, তাহা গিরি, কানন, পশু, পক্ষী, মেঘ ও বায়ু-সংবলিত অপরিসীম আকাশ-মার্গে প্রচণ্ডবেগে ঘূর্ণায়মান হইতেছে, ইহা চিন্তা করিয়া, অন্তঃকরণ বিকসিত করিতে পারেন। তিনি বাসনা-বর্ত্মে চন্দ্র-মণ্ডলে উপনীত হইয়া, উচ্চ পর্ব্বত, গভীর গহ্বর, উন্নত শিখর, গিরিচ্ছায়া, বন্ধুর ভূমি ইত্যাদি অবলোকন করিতে পারেন। ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়া, চন্দ্র-চতুষ্টয়-পরিবৃত বৃহস্পতি, বৃহত্তর চন্দ্রাষ্টক ও বিশাল-বলয়-ত্রয়-পরিবেষ্টিত শনৈশ্চর, ছয় চন্দ্র-সহকৃত হর্শেল গ্রহ এবং চন্দ্রদ্বয়-সংবলিত নেপচ্যান্-নামক অপূর্ব্ব ভুবন দর্শন

করিয়া, পরম-পুলকিত-চিত্তে বিচরণ করিতে পারেন। পরে গ্রহ-মণ্ডলী-পরিবেষ্টিত প্রচণ্ড সূর্য্য-মণ্ডল পশ্চাদ্ভাগে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সহস্র সহস্র কোটি কোটি নক্ষত্র-লোক অবলোকন করতঃ অশৃঙ্খল-বদ্ধ ও অক্লিষ্ট-পক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় অসীম আকাশ-মণ্ডল পর্য্যটন করিতে পারেন। গগন-মণ্ডলের যাবতীয় ভাগ দূরবীক্ষণ-সহকারে মানব-জাতির নেত্র-গোচর হইয়াছে, তদূর্দ্ধ সমস্ত নভঃপ্রদেশ সংখ্যাতিরিক্ত পরমাদ্ভুত জীবলোকে পরিপূর্ণ বলিয়া প্রতীতি করিতে পারেন, এবং অপার মহিমার্ণব মহেশ্বরের অখণ্ড রাজত্ব সর্ব্বত্র প্রচারিত দেখিয়া, ভক্তি-রসাভিষিক্ত-পুলকিত-হৃদয়ে অর্চ্চনা করিতে পারেন।

তিনি কখনও বা গগন-মণ্ডলস্থ ভূরিসংখ্য বৃহদাকার পদার্থ দর্শনে পরিতৃপ্ত হইয়া, সূক্ষ্ম পদার্থ পর্য্যবেক্ষণ-বাসনায় ধরাতলে অবতীর্ণ হইতে পারেন, এবং অণুবীক্ষণ-প্রদর্শিত অশেষবিধ অতি সূক্ষ্ম বস্তুর অশেষবিধ শোভা সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইতে পারেন। এরূপ সৌভাগ্যশালী বিদ্যাবান্ ব্যক্তি জীবের শরীরে ও বৃক্ষের পল্লবে যেরূপ শোভা, যেরূপ শিল্প ও যেরূপ অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করেন, অণুবীক্ষণের সৃষ্টি না হইলে, তাহা মানবজাতির দৃষ্টি-পথে কদাচ আবির্ভূত হইত না। যে ব্যক্তি উক্ত যন্ত্র-সহকারে সে সমুদায় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন, তাহা বর্ণন করিয়া তাঁহার হৃদয়ঙ্গম করিবার সম্ভাবনা নাই। বিদ্যালোক-সম্পন্ন সুশিক্ষিত ব্যক্তি এক এক জলবিন্দুতে কোটি কোটি জীবের অবস্থান ও সঞ্চরণ দেখিয়া পুলকিত হইতে থাকেন। অনভিজ্ঞ ব্যক্তির যে স্থানে কিঞ্চিৎ কলঙ্ক-যুক্ত চিহ্ন মাত্র বোধ হয়, তিনি সে স্থানে বৃহৎ অরণ্য দর্শন করেন। ইতর ব্যক্তিরা প্রজাপতির পক্ষ-সমূহে যে সমস্ত ক্ষুদ্ররেণু দৃষ্টি করে, তিনি তাহা বিহঙ্গগণের পক্ষ-সদৃশ

সুরাগ-রঞ্জিত, সুচারু পক্ষ-সমূহ জানিয়া, অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া থাকেন। অনভিজ্ঞ ব্যক্তি রাজ্য-বিশেষের রাজধানী-বিশেষ যেরূপ জনাকীর্ণ বোধ করে, তিনি কণা-প্রমাণ স্থান তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক জীবে পরিপূর্ণ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হন। অশিক্ষিত ব্যক্তি যে স্থান জীব-শূন্য অকর্ম্মণ্য বোধ করে, তিনি সে স্থান জ্ঞান ও ক্রীড়া, রাগ ও বাসনা, সুখ ও সন্তোষের আধার বলিয়া প্রতীতি করেন, এবং প্রত্যেক অণুপ্রমাণ স্থান পরমেশ্বরের অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় অভাবনীয় কীর্ত্তিতে পরিপূরিত দেখিয়া, ভক্তি-সহকৃত পরমানন্দ-রসে অভিষিক্ত হইতে থাকেন।

যে মহাত্মার অন্তঃকরণ এতাদৃশ অতি মনোহর সুখরাজ্যে বিচরণ করিতে পারে, তাঁহার অনুভূত সুখ অজ্ঞানাবৃত অশিক্ষিত ব্যক্তির সুখাপেক্ষায় অশেষগুণে উৎকৃষ্ট, তাহার সন্দেহ নাই। যদি মার্জ্জিত বুদ্ধি-পরিচালনে সুখোদয় হয়, যদি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এবং সুন্দর ও মহৎ অশেষবিধ পদার্থ-চিন্তনে সুখ-সঞ্চার হয় এবং যদি মহিমার্ণব পরমেশ্বরের অচিন্ত্য শক্তির ও অপার মহিমার অসংখ্য নিদর্শন-দর্শনে প্রগাঢ় সুখের উদ্ভব হয়, তবে জ্ঞানালোক-সম্পন্ন বিশুদ্ধচিত্ত সুশিক্ষিত ব্যক্তির পরমোৎকৃষ্ট নিরুপম সুখের উপমা দিবার আর স্থল নাই, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

পরিশিষ্ট।

মথুরা— ভারতবর্ষের কল্পনা-কেন্দ্র, স্বপ্ন-সম্ভাবনার অনুকূল স্থান। মথুরার নাম-নির্ব্বাচনের তাৎপর্য্য এই।

যমুনা— মথুরাতল-বাহিনী নদী; অন্য নাম কালিন্দী।

কারণ— কোনো বিশেষ ব্যাপারের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা-সমষ্টির মধ্যে যেটি অপরিহার্য্য অর্থাৎ যেটির অভাব ঘটিলে, বক্ষ্যমাণ ব্যাপারই ঘটিতে পারিত না, তাহাকে কারণ বলে।

কাব্য— লোকোত্তর-বর্ণনা-নিপুণ-কবি-কর্ম্ম। রসাত্মক বাক্যকে কাব্য বলে। রস আট প্রকার;—আদি, বীর, করুণ, হাস্য, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত। *

অলঙ্কার— যে শাস্ত্রের সাহায্যে কাব্যের দোষ গুণ বিচার করা যায়; যেমন সাহিত্য-দর্পণ, কাব্যাদর্শ।

জ্যোতিষ—যে শাস্ত্রের সাহায্যে গ্রহের গতি ও নক্ষত্রাদির সংস্থান নিরূপণ করা যায়; যেমন—সূর্য্য-সিদ্ধান্ত, আর্য্য-সিদ্ধান্ত।

গণিত— অঙ্কবিষয়ক অভ্রান্ত শাস্ত্র।—জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, জ্যোতিষ প্রভৃতিকে সজীব রাখিয়াছে।

* শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর-ভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যরসাঃ স্মৃতাঃ॥
কেহ কেহ শান্ত-নামক আর একটি রস স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে রস নয়টি।

স্মৃতি— যাহা পুরুষানুক্রমে স্মরণ করিয়া আসা হইতেছে ; যে শাস্ত্রের সাহায্যে সামাজিক আচার ও লোক-ব্যবহার নিরূপিত হইয়া থাকে ; যেমন—মনুসংহিতা।

দর্শন— পণ্ডিতেরা যাহা বুদ্ধি দ্বারা দর্শন করেন ; তত্ত্ব-বিদ্যা। যেমন —সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্বমীমাংসা, উত্তরমীমাংসা, ন্যায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধদর্শন, অর্হৎ দর্শন।

শারীরস্থান—অস্থি, মাংস-পেশী, মস্তিষ্ক, নাড়ী প্রভৃতির সংস্থান-নির্ণায়ক শাস্ত্র-বিশেষ।

রসায়ন— মূল পদার্থ-সমূহের সংযোগ-বিয়োগ-জনিত বৈষম্য-বিজ্ঞাপক শাস্ত্র-বিশেষ।

তিতিক্ষা—ক্ষমা, সহিষ্ণুতা।

কীটাণু— যে সমস্ত অতিসূক্ষ্ম কীট ক্ষুদ্রতার জন্য মানব-চক্ষুর অগোচর, তাহাদিগকে কীটাণু বলে।

আরব্য-উপন্যাস— আরব ও মিশর দেশ-প্রচলিত কথা-গ্রন্থ। অসম্ভব কল্পনায় কল্পতরু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কথা-সরিৎ-সাগর—সোমদেব ভট্ট-বিরচিত ছন্দোবদ্ধ গল্পের বহি। ইহার অনেক গল্পে ইন্দ্রজাল, পিশাচসিদ্ধি প্রভৃতি অদ্ভুত ক্ষমতার উল্লেখ আছে।

দূরবীক্ষণ—যে যন্ত্রের সাহায্যে দূরের বস্তু নিকটে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দূরবীক্ষণ ১৯০০ খৃষ্টাব্দের প্যারিস প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়।

অণুবীক্ষণ—যে যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষুদ্র বস্তু বৃহৎরূপে প্রতিভাত হয়।

প্রবৃত্তি— রুচি ; স্বাভাবিক ঝোঁক।

বেকন— (খৃঃ ১৫৬১-১৬২৬) ইনি পরস্পর বিচ্ছিন্ন খণ্ড :সত্য-সমূহের

অভ্রান্ততা পরীক্ষা করিয়া, পরিশেষে ঐ সকল পরীক্ষিত সত্যের উপর নির্ভরপূর্ব্বক ব্যাপক সত্যে উপনীত হইবার রীতি প্রবর্ত্তন করিয়া, বিজ্ঞানোন্নতির প্রভূত সহায়তা করেন। জন্মভূমি—ইংলণ্ড।

সিসিরো—(খৃঃ পূঃ ১০৬...৪৩) প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও গ্রন্থকার। জন্মভূমি ইত্যাদি।

হিতোপদেশ-কর্ত্তা—বিষ্ণু শর্ম্মা হিতোপদেশ-কর্ত্তা বলিয়া প্রবাদ সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে।

সেনেকা— (খৃঃ ৩—৬৫) ইতালির পণ্ডিত ও লেখক।

উপরিস্থিত বায়ু...শীতল—উপরের বায়ুস্তর সূর্য্যের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইলেও শীতল। রৌদ্রতপ্ত পৃথিবীর সংস্পর্শে নিম্নস্তরের বায়ু তপ্ত হইয়া থাকে।

চন্দ্রকিরণে রামধনু—চন্দ্র-মণ্ডলেও অনেক সময়ে রামধনুর বিচিত্র বর্ণ দেখা যায়।

তাড়িত...সূক্ষ্ম পদার্থ—উত্তাপ, আলোক ও তাড়িতকে বস্তু বলা যায় না; কারণ বস্তুর গুরুত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম এ সকলের একটিতেও নাই, উহাদিগকে পদার্থ বলা যায়, কারণ, পদের অর্থই (অর্থাৎ শব্দের প্রতিপাদ্যই) পদার্থ।

প্রত্যন্তপর্ব্বত—প্রান্তবর্ত্তী পর্ব্বত।

পাণ্ডব—পাণ্ডুর অপত্য; যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব।

কৌরব—কুরুবংশীয় দুর্য্যোধনাদি।

আলেক্‌জাণ্ডার—মাসিডোনিয়ার অধীশ্বর সুপ্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী বীর। জন্ম, খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৫৬ অব্দে, মৃত্যু খৃঃ পূঃ ৩২৩ অব্দে।

সীজর— (খৃঃ পূঃ ১০১—৪৪) পুরুষোত্তম বলিলে, যেমন বিষ্ণুকে বুঝায়,

সীজর বলিলে, তেমনি দিগ্বিজয়ী জুলিয়স্ সীজরকে বুঝায়। সীজর শব্দ পরে সম্রাটের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়।

হানিবল— (খৃঃ পূঃ ২৪৭—১৮৩) কার্থেজের সুপ্রসিদ্ধ মহাবীর; ইনি রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

হোমর— য়ুরোপ খণ্ডের প্রথম এবং প্রধান মহাকাব্য রচয়িতা; জন্মভূমি গ্রীস্ অথবা এসিয়া মাইনর। হোমর অর্থে অন্ধ। ইনি খৃষ্টের প্রায় নয় শত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হন।

বাল্মীকি— ভারতবর্ষের কবিগুরু। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রামায়ণের রচয়িতা। প্রথম জীবনে নাকি দস্যু ছিলেন।

কালিদাস—নবরত্নের শ্রেষ্ঠ রত্ন; ইঁহার জন্মভূমি ও জীবনকাল-সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে ঘোরতর মতবৈলক্ষণ্য আছে।

মাঘ— 'শিশুপাল-বধ'-নামক কাব্যের রচয়িতা। প্রবাদ আছে, তিনি রাজমন্ত্রী ছিলেন।

ভারবি— কালিদাসের পরবর্ত্তী এবং মাঘের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি। প্রধান কাব্য "কিরাতার্জ্জুনীয়ম্"।

ভবভূতি— প্রায় বার শত বৎসর পূর্ব্বে ইনি দাক্ষিণাত্যে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থগুলির নাম—মালতীমাধব, মহাবীর-চরিত এবং উত্তর চরিত।

ভারতচন্দ্র—(১১১৯—১১৬৭ সাল) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভা-কবি। প্রধান কাব্য—অন্নদামঙ্গল।

বর্জ্জিল— (খৃঃ পূঃ ৭০—১৯) প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যের মহাকবি। প্রধান কাব্য—ঈনিড্।

ডান্টে— (খৃঃ ১২৬৫—১৩২১) খৃষ্টান্ ইতালির প্রধান কবি। প্রধান রচনা—কমিডিয়া ডিভিনা।

মিল্টন—(১৬০৮—১৬৭৪) ইংলণ্ডের মহাকবি। প্রধান কাব্য—প্যারাডাইজ্ লষ্ট্।

সেক্সপিয়র—(১৫৬৪—১৬১৬) জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। বিচিত্র চরিত্র চিত্রণে পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয়।

বায়রণ— (১৭৮৮—১৮২৪) ইংলণ্ডের প্রতিভা-প্রতিমা। জগদ্বিখ্যাত কবি।

আর্য্যভট্ট—(খৃঃ ৪৭৬—) জন্মস্থান—পাটনা। ইনি বীজগণিতের অনেক নিয়ম আবিষ্কার করেন। মতান্তরে বীজগণিতের সৃষ্টিকর্ত্তা। প্রধান গ্রন্থ—আর্য্য-সিদ্ধান্ত।

বরাহ-মিহির—(খৃঃ ৫৮৭) নবরত্নের অন্যতম। প্রধান গ্রন্থ—বৃহজ্জাতক, বৃহৎ সংহিতা।

ব্রহ্মগুপ্ত—(খৃঃ ৬২৮)—জ্যোতির্ব্বেত্তা। প্রধান গ্রন্থ—ব্রহ্মগুপ্ত সিদ্ধান্ত।

ভাস্করাচার্য্য—(খৃঃ ১০০০—) লীলাবতী ও সিদ্ধান্ত শিরোমণির রচয়িতা। মতান্তরে Differential Calculusএর জন্মদাতা।

কোপর্নিকস্—(১৪৭৩—১৫৪৩) জর্ম্মন, জ্যোতির্ব্বিদ্। প্রাচীন মিশরের মতে বুধ, ও শুক্র সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, কিন্তু সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে; এইরূপ নানা বিচিত্র মতের সমন্বয় করিতে গিয়া কোপনিকস্ সৌর-জগতের রহস্যোদ্‌ঘাটন করিয়া ফেলেন।

গ্যালিলিয়ো—(১৫৬৪—১৬৪২) হান্স লিপার্শে কৃত আদিম দূরবীক্ষণ যন্ত্রের প্রভূত উন্নতি বিধান করেন। পৃথিবীর আহ্নিকগতি স্বীকার করা অপরাধে ধর্ম্মযাজকদের হস্তে নিগৃহীত হন।

নিউটন—(১৬৪২—১৭২৭) ইঁহার মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধীয় সত্য নির্দ্ধারণের ফলে বিজ্ঞান-জগতে নব যুগের সূত্রপাত হয়।

বেদব্যাস—(খৃঃ পূঃ ১৬০০…১৫০০) ইনি দাস-রাজ-কন্যা মৎস্য-গন্ধার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াও বেদ পড়িতে পাইয়াছিলেন। এমন কি, অনেকটা তাঁহারই কৃপায় বেদ বর্ত্তমান কলেবর লাভ করিয়া সুবিন্যস্ত ভাবে রক্ষিত হইয়াছে। এই ধীবর-দৌহিত্র জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদিগের সভায় আসন পাইয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্য—খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে কেরল দেশে প্রাদুর্ভূত হন। ইনি ধর্ম্ম-সংস্কারক, বেদান্ত-ভাষ্যকার এবং বহু মঠের সংস্থাপক। এই মহাত্মা বত্রিশ বৎসর বয়সে তনুত্যাগ করেন।

প্লেটো—(খৃঃ পূঃ ৪২৭—৩৪৭) গ্রীস্ দেশের দার্শনিক। ইঁহাকে Father of idealism বলে।

পিথাগোরস—(খৃঃ পূঃ ৫৮২) গ্রীস্-দেশীয় নীতি-সংস্কারক এবং নূতন দার্শনিক মতের প্রবর্ত্তক। ইনি জন্মান্তর-বাদ স্বীকার করিতেন। আমিষ-ভোজনেরও বিরোধী ছিলেন।

তদুপযোগী চঞ্চু—এখনকার বৈজ্ঞানিকদের মতে, ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসীদের যে জন্য বাহু শুষ্ক হইয়া যায়, ঠিক সেই কারণেই, অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনার অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা-বশতঃই জীব-বিশেষের অঙ্গ-বিশেষের বৈষম্য ঘটিয়া থাকে।

সক্রেটিস—(খৃঃ পূঃ ৪৭০—) জ্ঞানী, জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ। প্রচলিত ধর্ম্ম-মত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে স্বকীয় মত প্রচার করা অপরাধে (!) প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

নিকল্—আমাদের 'এক আনি' যে ধাতুতে প্রস্তুত হয়, উল্কাতেও সেই নিকল্ ধাতু পাওয়া গিয়াছিল।

উৎসেধ—উচ্চতা।

এতদ্দেশীয়…গৃহনির্ম্মাণ—মধ্যযুগে য়ুরোপেও ঐরূপ ছিল। যখন

সম্যক্ শাসনের অভাবে জীবন ও ধন-সম্পত্তি রক্ষিত বলিয়া বিবেচিত না হয়, সেই সময়ে ঐরূপ গৃহ-নির্ম্মাণ-পদ্ধতি অবলম্বিত হওয়া স্বাভাবিক। সকল দেশ-সম্বন্ধেই এ নিয়ম খাটে। তাহার পর সুশাসনের সময়েও পূর্ব্বাভ্যাসের হস্ত হইতে সহজে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না।

অনেক মন্দিরই এক-দ্বার—নহিলে যাত্রীদের নিকট হইতে পয়সা আদায়ের সুবিধা হয় না।

জিজীবিষু—বাঁচিতে ইচ্ছুক।

বৃন্দাবন—যমুনার পশ্চিমকূলে; বৈষ্ণবদিগের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

কুরুক্ষেত্র—আধুনিক নাম কর্ণাল। "ক্ষেত্রং ক্ষত্র-প্রধন-পিশুনং"

হরিদ্বার—ইহাকে গঙ্গাদ্বারও বলে। এইখানে গঙ্গাপ্রবাহ পর্ব্বত হইতে সমতল ক্ষেত্রে পতিত হইতেছে। এই তীর্থে, কুম্ভ মেলার সময়ে বহু সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়া থাকে।

কনখল— গঙ্গার পশ্চিম কূলে; হরিদ্বারের সমীপবর্ত্তী গ্রাম; তীর্থস্থানও বটে।

"খলঃ কো নাত্র মুক্তিং বৈ ভজতে তত্র মজ্জনাৎ।
অতঃ কনখলং তীর্থং নাম্না চক্রুর্মুনীশ্বরাঃ॥"

——স্কন্দপুরাণ।

বহুরূপ—চলিত ভাষায় বহুরূপী।

স্প্রাট— হেরিংজাতীয় মৎস্য-বিশেষ। য়ুরোপের পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের কিয়দংশে এবং নিউজিলণ্ডে ও সরিনামের (ডচ্ গায়েনার) সমীপস্থ সাগরে পাওয়া যায়।

অঙ্গুরীয়ক-ত্রয়—ইহাকে উপবীতও বলে; মুক্তার ত্রিবল্লীহার বলিলে মন্দ হয় না।

হর্শেল—(১৭৩৮—১৮২২) জন্মস্থান—হ্যানোভার। ইনি য়ুরেনাস্ নামক নূতন গ্রহের আবিষ্কর্ত্তা। ঐ গ্রহকে আবিষ্কর্ত্তার নামানুসারে হর্শেল গ্রহও বলা হয়। আবিষ্কর্ত্তা স্বয়ং কিন্তু ঐ গ্রহের নাম রাখিয়াছিলেন—জর্জ্জিয়াস্ সাইডাস্।

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের পৌত্র

সুকবি শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রণীত কাব্যগ্রন্থ

তীর্থ-সলিল।

ছাপা, কাগজ পরিপাটী। পরম উপভোগ্য মনোজ্ঞ পুস্তক। উপহার দিবার উপযুক্ত। মূল্য এক টাকা। সর্ব্বত্র বিশেষভাবে প্রশংসিত।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—অনুবাদ পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছি। অধিকাংশকেই অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। একই কালে অনুবাদ এবং নূতন কাব্য। **শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর**—ইহা আমাদের পরম আহ্লাদ ও গৌরবের বিষয়। **শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর**—এরূপ বিচিত্র সংগ্রহ বঙ্গসাহিত্যে আর আছে কি না, জানি না। এই গ্রন্থকে বিচিত্র রত্নমালাও বলা যাইতে পারে। **শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র**—I very much like it. The style is very good. The translations are accurate and are not like translations. **প্রবাসী**—জগতের সকল দেশের সকল কালের শ্রেষ্ঠ কবিদিগের সকল ভাবের রচনার কাব্যানুবাদ এই পুস্তকে একত্র করিয়া একটি মনোজ্ঞ সংগ্রহ হইয়াছে। কবিতাগুলি মৌলিক রচনার সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত। এই গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ্ হইয়াছে। কাব্যরসপিপাসু বা মানবচরিত্র-জিজ্ঞাসু পাঠক এই গ্রন্থে আনন্দের উপাদান পুঞ্জীকৃত দেখিবেন। **বসুমতী**—সভ্য জগতের অধিকাংশ সুকবির ললিত ভাবময়ী কবিতার অনুবাদ এই গ্রন্থে মধুর ভাষায় সুন্দর ছন্দে প্রকাশিত হইয়াছে। **বঙ্গবাসী**—অনুবাদে একাধারে কবিত্বের ও বিদ্যাবত্তার পূর্ণ পরিচয়। **ভারতী**—তীর্থসলিলের জন্য একটি মুদ্রা ব্যয় করিলে, তাহা জলে যাইবে না, একথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।